স্বলাত শেষে বিতর্কিত

জামাআতী মুনাজাত

ও

মাগরিবের পূর্বে দু'রাকআত নফল

মওলানা আব্দুল হাকিম ও মাঝহারুল ইসলাম সাহেবানের জবাবী বই

সংকলনে ঃ
আব্দুল্লাহ সালাফী
তথ্য সরবরাহে ঃ
আব্দুল হামীদ মাদানী

সূচীপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এ কথা অনস্বীকার্য যে, বিলীয়মান ধূমায়িত ফিতনা কোথাও কোথাও জ্বলে উঠলে এবং এক শ্রেণীর উলামা নিজেদেরকে বিশেষ ময়দানে বিজয়ী ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী মনে করলে জনসাধারণের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। তদ্দর্শনে দেশের কিছু গণ্যমান্য উলামায়ে কেরাম যদি এই জবাবী বই লিখার জন্য উৎসাহ না দিতেন, তাহলে হঠাৎ করে এই বই লিপিবদ্ধ করার জন্য এই ব্যস্ততার মধ্যে কলম ধরা আমার সৌভাগ্য হয়ে উঠত না। আল্লাহ তাঁদের 'জাযায়ে খায়র' প্রদান করুন।

সর্বোপরি ভাই আব্দুল হামীদ মাদানী (হাফিযাহুল্লাহ), পুস্তকে ব্যবহৃত সিংহভাগ তথ্য যোগাড় করে দিয়ে আমার শ্রম লাঘব করে দিয়েছেন। কোন কোন স্থানে হুবহু তাঁরই ভাষা স্থান পেয়ে গেছে। আমি আল্লাহর কাছে তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করি এবং তাঁর দ্বারা মুসলিম মিল্লাত আরও বেশী উপকৃত হোক, সেটাই মহান রবের কাছে কামনা করি।

আমার উস্তায শায়খ আযীযুর রহমান সালাফী রচিত 'দুআ কে আদাব ও আহকাম' বই হতেও কিছু তথ্য নিয়েছি। লেখনি চালিয়ে যাওয়ার সময়ে শায়খ আবুল কাসিম জঙ্গীপুরী (হাফিযাহুল্লাহ)এর বই 'দুআ করুন ও বিদআত থেকে বাঁচুন' (২য় খণ্ড) আমার পাশে ছিল। সেখান হতেও অল্প-বিস্তর উপকৃত হয়েছি।

এ ছাড়া নিজের শ্রম ও মেধার দ্বারা যা সম্ভব হয়েছে, তা আপনাদের সামনে আছে।

আল্লাহ এঁদের সকলের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন ও পরকালে সম্মানজনক অবস্থানে এঁদের আসীন করুন। আমীন।

বিনীত -
আব্দুল্লাহ সালাফী
হলদী, সাগর দিঘী
মুর্শিদাবাদ
রমযান ১৪২৯হিঃ

আগে পড়ার বিষয়

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد:

فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} (٥٩) سورة النساء

ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর সহীহ বুখারীতে এক পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন, باب العلم قبل القول والعمل "কথা বলা ও কাজ করার পূর্বে জ্ঞানার্জন করা অত্যাবশ্যক।" অতঃপর সূরা মুহাম্মাদের ১৯নং আয়াত দ্বারা তা প্রমাণিত করেছেন। আল্লাহ বলেন,

{فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} (١٩) سورة محمد

এই আয়াতে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পূর্বে সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে বলেছেন। সূরা বানী ইস্রাইলের ৩৬নং আয়াতে আল্লাহ স্বীয় বান্দাগণকে সতর্ক করেছেন এই মর্মে যে, তারা যেন প্রকৃত জ্ঞান ছাড়া কোন বিষয়ের পিছনে না পড়ে। কেননা শ্রবণ, দর্শন ও বোধশক্তি সম্পর্কে তাদের প্রশ্ন করা হবে।

আব্দুল্লাহ বিন আমর ﷺ হতে বর্ণিত হাদীসে নবী মুহাম্মাদ ﷺ বলেন, আল্লাহ বিদ্যাকে লোকেদের হতে (কোন বস্তু ছিনিয়ে নেওয়ার মত) ছিনিয়ে নেবেন না; বরং তা হরণ করে নেবেন (প্রকৃত) জ্ঞানীদের মৃত্যু দান করে। অতঃপর যখন কোন যোগ্য আলিম আর অবশিষ্ট রাখবেন না, তখন লোকেরা অনভিজ্ঞ নেতৃবর্গকে (মুরব্বী) হিসাবে চিহ্নিত করবে। এদেরকে (বিভিন্ন সমস্যায়) প্রশ্ন করা হবে। আর তারা প্রকৃত জ্ঞান ছাড়া তার সমাধান বাত্‌লাবে। পরিণামে তারা স্বয়ং গুমরাহ হবে ও লোকদেরকেও গুমরাহ বানাবে। *(বুখারী ও মুসলিম, মিরআতুল মাফাতীহ শারাহ মিশকাতুল মাসাবীহ ১ম খন্ড ৩১১ পৃঃ মুদ্রণে মাকতাবাহ সালাফিয়্যাহ বানারস)*

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় উবাইদুল্লাহ রহমানী (রহঃ) বলেন,

وفي الحديث الحث على العلم والتحذير عن ترئيس الجهلة وذم من يقدم على الإفتاء بغير

علم.

অর্থাৎ, হাদীসটিতে প্রকৃত জ্ঞানার্জন করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। সতর্ক করা হয়েছে জ্ঞানবিমুখ অনভিজ্ঞ লোকেদের নেতা হিসাবে বরণ করা হতে এবং বিনা ইলমে ফতোয়াদাতাদের নিন্দা করা হয়েছে।

ইসলাম সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ প্রেরিত দ্বীন। আল্লাহ এতে কোন মানুষের মতামতের বিন্দুমাত্র অবকাশ রাখেননি। এমনকি নবীকূল শিরোমণি মুহাম্মাদ ﷺ-এরও ব্যক্তি-স্বাধীনতা ছিল না, বিনা ইলমে অহীতে কোন মাসআলা বর্ণনা করার। আল্লাহর বিনা অর্ডারে ছিল না তাঁর ফাত্‌ওয়া প্রদানের অধিকার।

আল্লাহ পাক বলেন,

وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى (٤) سورة النجم

অর্থাৎ, তিনি মুহাম্মাদ ﷺ প্রকৃত্তির অনুসারী হয়ে কিছু বলেন না। (তিনি যা বলেন তা হল) নির্ভেজাল অহী যা তাঁর প্রতি প্রেরণ করা হয়। (সূরা নাজ্‌ম ৩-৪ আয়াত) এ বিষয়ে নবী ﷺ-এর প্রতি চরম সতর্কবাণী উচ্চারণ করতঃ অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ (٤٤) لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٤٥) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (٤٦) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (٤٧) سورة الحاقة

"তিনি (মুহাম্মাদ ﷺ) যদি কষ্টকল্পনা করে সামান্যতম কথা বলেন (যা আমি বলতে বলিনি), তাহলে অবশ্যই আমি তাঁর ডান হাতকে ধরব। অতঃপর তাঁর কণ্ঠনালীকে কেটে দেব। (আর এই শাস্তি বিধানে) তোমাদের কেউ বাধা প্রদান করতে পারবে না। *(সূরা হা-ক্বাহ ৪৪-৪৭ আয়াত)*

তাই আল্লাহ জাল্লা শা'নুহু বান্দা সকলকে আদেশ করেছেন নিঃশর্তভাবে তাঁর ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করার। তিনি বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (٣٣) سورة محمد

অর্থ, হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রসূলের। আর (অন্যভাবে আমল ক'রে) নিজেদের (ভাল) আমলসমূহকে বিনষ্ট করো না। *(সূরা মুহাম্মাদ ৩৩ নং আয়াত)*

ফলস্বরূপ যে কোন ভাল কাজ করার পূর্বে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ হতে অনুমোদন আছে কি না, তা জেনে নেওয়া সকলের জন্য আবশ্যক। বিনা প্রমাণে ইসলামে কোন কাজ করা ঘোরতর অপরাধ। বিদআত হল, এমন ভাল কাজের সমষ্টি, যা আল্লাহ নির্দেশিত ভাল কাজের আদলে শয়তান সমান্তরালভাবে আবিষ্কার করেছে। এই

উদ্দেশ্যে যাতে মানুষ ধোকা খেয়ে আসল ইসলাম হতে বিচ্যুত হয়ে জাল ইসলাম নিয়ে মেতে ওঠে।

আল্লাহ বলেন,

{أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُمْ} (١٤) سورة محمد

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিজের রব (আল্লাহর) দলীলের উপর টিকে আছে, সে কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় পথভ্রষ্ট হতে পারে, যার মন্দ কর্মকে (শয়তান দ্বারা) সুন্দর করে দেখানো হয়েছে এবং তারা স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। *(সূরা মুহাম্মাদ ১৪ নং আয়াত)*

শয়তান তার অনুচরবৃন্দ কর্তৃক পৃথিবীতে এত বেশী ইসলাম বহির্ভূত আমল চালু করেছে যে, সাধারণ মানুষ এদের দুষ্টচালে বিভ্রান্ত ও দ্বিধাগ্রস্থ। সরল প্রকৃতির মানুষ এদের চাক-চিক্যময় কথা ও বক্তৃতার মায়াজালে ফেঁসে গিয়ে ইহ-পারলৌকিক অকল্যাণের শিকার হয়ে চলেছে।

শয়তান ও তার দোসরদের দ্বারা যে সমস্ত আমলের ব্যাপারে জনগণ বিভ্রান্ত হচ্ছে তার ফিরিস্তি বড় লম্বা। আলোচ্য পুস্তিকায় আমি এমন দু'টি আমলের উপর আলোকপাত করতে চলেছি, যে দু'টি নিয়ে বিস্তর লেখা-লেখি ও তর্কবিতর্ক হয়েছে। তার মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয স্বলাতের পরে হস্তোত্তোলন পূর্বক সম্মিলিত দুআ, আর দুই নম্বর হচ্ছে, মাগরিবের ফরয নামাযের পূর্বে দু' রাকআত নফল স্বলাত আদায় করা।

ফরয স্বলাত শেষে সম্মিলিত দুআকে কেন্দ্র করে সপক্ষে-বিপক্ষের বহু পুস্তক-পুস্তিকা সমাজে আত্মপ্রকাশ করেছে। দুআ পন্থীদের মায়াকান্নার প্রভাব কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর অনুসারীদের উপরে পড়েনি বললেই চলে। অধিকাংশ মসজিদে বেদলীল এই আমলটি প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এতদসত্ত্বেও এ যাবৎ কিছু পরশ্রীকাতর, স্বার্থান্বেষী, অপরিণামদর্শী ও প্রকৃত ইল্‌ম সম্পর্কে অনভিজ্ঞ আলিম বিভ্রান্তির বেড়াজাল বিস্তার করেই চলেছেন। আমার সামনে বীরভূম জেলার অন্তর্গত অবিনাশপুর গ্রামের প্রখ্যাত আলিম শায়খ আব্দুর রউফ শামীম সাহেবের সহোদর মওলানা আব্দুল হাকীম ও মুমিন টোলা সিনিয়র মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক মাওলানা মাঝহারুল ইসলাম (সঠিক উচ্চারণ মায্‌হারুল ইসলাম) সাহেবানের দুটি 'বদনামে যামানা' পুস্তিকা আছে। প্রথম পুস্তিকাটির নাম 'দোয়ায়ে হাকিম ঃ সালাতে হাকিম'। এই নামকরণ শরীয়তের দৃষ্টিতে অন্যায়; যা পরবর্তী আলোচনায় যথাস্থানে পড়তে পাবেন ইনশাআল্লাহ। আর অপরটি 'প্রশ্নোত্তরে ফরয নামাযের পর দোওয়া'।

লেখকদ্বয় আরবী ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে যেমন অপরিপক্ক, অনুরূপভাবে ইল্‌মে

হাদীসে পাক ও তার গ্রহণ-বর্জন নীতির প্রাইমারী ধ্যান-ধারণা ছাড়া সে বিষয়ে কলম ধরার ধৃষ্টতা প্রকাশ করেছেন। সত্যই হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে যেমন রোগীদের প্রাণ নিরাপদ নয়, অনুরূপভাবে হাতুড়ে মৌলবীদের কাছে ঈমানদারদের ঈমান নিরাপদ নয়।

কথায় বলে, 'নীম হাকীম খাতরায়ে জাঁ, নীম মুল্লাহ খাতরায়ে ঈমাঁ।'

ফরয স্বলাতের পরে 'সম্মিলিতভাবে ইমামের দুআ করা ও মুক্তাদীগণের আমীন বলা'র সপক্ষে ওকালতি ক'রে প্রয়াত আলিম শায়খ নিযামুদ্দীন সালাফী হিরণপুরী পরে হোসাইন নগরী 'নিযামুদ্দুআ' নামকরণ ক'রে বই লিখেছিলেন। উপরোক্ত লেখকদ্বয় শেষোক্ত বইটি হতে তেমন কোন বেশী কথা লিখেননি। সাগরদিঘী থানার প্রত্যন্ত গ্রাম কাবিলপুর গ্রামের অধিবাসী জনৈক সিরাজুদ্দীন সালাফীও এ বিষয়ে কিছু লেখা-লেখি করেছেন। মুর্শিদাবাদ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রাক্তন সভাপতি প্রখ্যাত বাগ্মী ও সুযোগ্য আলিম আবুল কাসিম গঙ্গাপ্রসাদী-জঙ্গীপুরী 'দুআ করুন ও বিদআত হতে বাঁচুন' নাম দিয়ে ফরয স্বলাত শেষের 'সম্মিলিত দুআ'র বিপক্ষে দুই খন্ডে সুন্দর বই লিখেছেন।

আমাদের ইচ্ছা ছিল না শিশুসুলভ লেখক এই আলিমগণের লেখা নিয়ে পুনঃ কিছু লেখার ও নিজের মূল্যবান সময়সমূহকে এই তুচ্ছ কাজে খরচ করার। কিন্তু আল্লাহ বলেন,

{وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ} (٢٥١) سورة البقرة

অর্থাৎ, যদি আল্লাহ অংশ বিশেষ লোকেদের দ্বারা অংশ বিশেষ (মন্দ) লোকেদের প্রতিহত না করতেন, তাহলে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি হত। *(সূরা বাকারাহ ২৫১ নং আয়াত)*

সরলমতি অনেক আবিদ মানুষ যাতে এঁদের চক্রান্তে মোহাবিষ্ট হয়ে আমল ক'রে কিয়ামতের দিন রিক্ত হস্তে উপস্থিত না হন, সে জন্য এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে এই আয়াতের নির্ভেজাল ও নিবেদিত-প্রাণ অনুসারী বানিয়ে দেন। যাতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

فَبَشِّرْ عِبَادِ، الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمْ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الأَلْبَابِ.

অর্থাৎ, (হে নবী!) আপনি আমার বান্দাকুলকে শুভ সংবাদ প্রদান করুন; যারা (বহু) কথা শুনে তার মধ্যে যেটা উত্তম সেটার অনুসরণ করে। (যাদের এমন চরিত্র) তাদেরকেই আল্লাহ সুপথ বাতলে দেন। আর একমাত্র তারাই বুদ্ধিমান। *(সূরা যুমার ১৭-১৮ নং আয়াত)*

আল্লাহ গো! তুমি সত্যকে সত্য হিসাবে চিহ্নিত করার ও সেটাকে বাস্তবে রূপায়িত

করার তাওফীক দান কর এবং অসত্যকে অসত্যরূপে নির্ণীত করার ও তা থেকে শত যোজন দূরে থাকার ক্ষমতা দান কর। আমীন!

প্রথম পরিচ্ছেদ

শরীআতে মুহাম্মাদিয়াহতে দুআর অবস্থান

মানুষ জীবশ্রেষ্ঠ হলেও সে নিজ অস্তিত্ব রক্ষায় ও জীবন যুদ্ধে অন্যের সাহায্য ব্যতীত অচল। জীবনের বহু এমন বিষয় আছে যেখানে মানুষ এককভাবে আল্লাহর করুণা ও সাহায্যের প্রতি নির্ভরশীল। চরম ও পরম বিত্তবান ও মুখাপেক্ষীহীন সত্তা হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ। তিনি বলেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ} (١٥) سورة فاطر

অর্থাৎ, হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর মুখাপেক্ষী। আর আল্লাহ হচ্ছেন অমুখাপেক্ষী প্রশংসিত। *(সূরা ফাত্বির ১৫ নং আয়াত)*

সুতরাং এমন এক স্রষ্টা আল্লাহর কাছে মানুষ বিনীতভাবে আবেদন-নিবেদন করবে এটাই স্বাভাবিক। বিনয়ী বান্দাদের দুআ বা আবেদন যে তিনি প্রত্যাখ্যান করবেন না, সেটা স্পষ্টরূপে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন,

{ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} (٦٠) سورة غافر

অর্থাৎ, আমাকে আহবান কর (দুআ কর), আমি তোমাদের দুআকে কবুল করব। *(সূরা মু'মিন আয়াত নং ৬০)*

আল্লাহ জাল্লা শা'নুহু যে সর্বাবস্থায় বান্দার আকুতি ও আবেদনকে কবূল করেন, সে কথা তিনি স্বয়ং ঘোষণা করেছেন,

{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} (١٨٦) سورة البقرة

অর্থাৎ, (হে নাবী!) আমার বান্দাগণ যদি আপনাকে (আমার অবস্থান সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করে (এই মর্মে যে, আমি দূরে না নিকটে), তাহলে আপনি তাদের বলে দিন যে, আমি (তাদের) নিকটেই রয়েছি। আমি আহবানকারীর আহবানের জবাব প্রদান করি যখনই সে আমাকে আহবান করে। অতএব (তাদের কর্তব্য হল) তারা যেন আমার নির্দেশকে মেনে চলে ও আমার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখে, তাহলে তারা সুপথপ্রাপ্ত হবে। *(সূরা বাক্বারাহ ১৮৬নং আয়াত)*

কিভাবে আল্লাহ পাকের নিকট চাইতে হবে তা তিনি নিজেই বলে দিয়ে দিয়েছেন,

{ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (٥٥) سورة الأعراف

অর্থাৎ, তোমরা নিজেদের পালনকর্তাকে বিনীতভাবে ও সংগোপনে ডাক। নিশ্চয় তিনি সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। *(সূরা আ'রাফ ৫৫ নং আয়াত)*

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত যে, উপরে বর্ণিত আয়াতসমূহ যে মহান ব্যক্তির প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি হচ্ছেন স্বয়ং নবী মুহাম্মাদ ﷺ। তিনি যেমন আল্লাহর তরফ হতে আয়াতপ্রাপ্ত হয়েছেন, অনুরূপ তিনি তাঁর ব্যাখ্যাও প্রাপ্ত হয়েছেন। কোন্ আদেশের কি অর্থ এবং কিভাবে তার প্রয়োগ হবে, সবকিছু জিব্রাঈল ﷺ মারফৎ তিনি শিখেছেন। এ জন্যই মহান আল্লাহ তাঁর নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে ঘোষণা করতে বলেন,

{قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }

অর্থাৎ, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন ও তোমাদের অপরাধসমূহকে ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াবান। তোমরা আল্লাহ এবং (তাঁর) রসূলের আনুগত্য কর। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে জেনে রাখ, নিশ্চয় তিনি কাফিরদেরকে পছন্দ করেন না। *(সূরা আলে ইমরান ৩১-৩২ আয়াত)*

আয়াত সমুহের ব্যাখ্যা স্বয়ং আল্লাহ জিব্রাঈল মারফত শিখিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

{ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} (١٩) سورة القيامة

অর্থাৎ, অতঃপর তার ব্যাখ্যা বলে দেওয়ার দায়িত্ব আমার। *(সূরা ক্বিয়ামাহ আয়াত নং ১৯)*

দুআর আদেশসূচক আয়াতসমূহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়ে কার বেশী বুঝার যোগ্যতা ও অধিকার আছে? অতএব তিনি যেখানে যেভাবে দুআ করেছেন অথবা করতে বলেছেন তার বাইরে আমাদের কারোও কিছু করার বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা নেই।

দুআ হচ্ছে ইবাদতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। কেননা, দুআর মাধ্যমে বান্দার দীনতা ও হীনতা যেভাবে প্রকাশিত হয় অন্য ইবাদতে তা হয় না। স্বলাতের পুরোটাই দুআ বিজড়িত হওয়ার জন্যই স্বলাতকে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। *(সূরা ২৯ আয়াত নং ৪৫)*

নু'মান বিন বাশীর ﷺ হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

اَلدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةِ.

অর্থাৎ, দুআটাই হচ্ছে ইবাদত। *(তাহক্বীক্বে মিশকাত আলবানী ২য় খন্ড ৬৯৩ পৃষ্ঠা)*

যখন প্রমাণিত হল যে, দুআ ইবাদতের মূল, তখন সেটা বিনা দলীলে প্রমাণ করা যাবে না। যে কোন ইবাদত বিনা দলীলে করাটাই বিদআত। সমস্ত অসূলের বইসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে যে,

الأصل في العبادة المنع إلا بالدليل، والأصل في المعاملة الإباحة إلا بالدليل.

অর্থাৎ, ইবাদত করার জন্য দলীল চাই, দলীল না থাকলে তা হারাম। ব্যবহারিক বিষয়ে নিষেধের জন্য দলীল চাই, নতুবা তা বৈধ বলে গণ্য হবে।

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَن أَحدَثَ فِي أَمرِنَا هَذَا مَا لَيسَ مِنهُ فَهُوَ رَدٌّ.

অর্থাৎ, কেউ যদি আমার (আনীত) দ্বীনে নতুন কিছু করে, যা তার মধ্যে নেই তাহলে তা বর্জনীয়। *(বুখারী, মুসলিম, তাহক্বীক্ব মিশকাত- হাদীস নং ১৪০, পৃষ্ঠা ৫১)*

মি'রাজের ঘটনার প্রাক্কালে স্বলাত ফরয ঘোষিত হওয়ার পর আনুমানিক ৩২ হাজার স্বলাতের ইমামতি রসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন। তার একটিতেও আমাদের দেশে প্রচলিত সম্মিলিত দুআর সহীহ প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাছাড়া 'আমীন' ব্যতীত স্বলাতের মধ্যে সশব্দে দুআ পড়ারও প্রমাণ পাওয়া যায় না। বুখারীতে বর্ণিত রিফা-আহ বিন রাফি' দ্বারা বর্ণিত 'রাব্বানা লাকাল হামদু হামদান কাসীরান ত্বাইয়্যেবান মুবারাকান ফীহ' জনৈক ব্যক্তি দ্বারা সশব্দে বলাটা ব্যতিক্রম ঘটনা। এটা ব্যতিক্রম ঘটনা বলেই তাঁর পড়ার উপর রসূলুল্লাহ ﷺ প্রশ্ন করেছিলেন। *(তাহক্বীক মিশকাত হাদীস নং ৮৭৭)*

আল্লাহর রসূল ﷺ সালাম ফিরার পূর্বে তাশাহহুদে বসে যে সমস্ত দুআ পড়তেন, তার বিশদ তথ্য স্বলাত শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে রচিত বইসমূহে আপনি দেখে নিতে পাবেন। অনুরূপভাবে সালাম ফিরার পর দুআ সম্বলিত যে যিক্র-আযকার করতেন তারও নিখুঁত আলোচনা আপনি সেগুলিতে পড়তে পাবেন। যদি আপনি হাদীসসমূহ হতে সরাসরি অধ্যয়নে অক্ষম হন, তাহলে বাংলা ভাষায় লিখিত সব থেকে নির্ভরযোগ্য স্বলাত শিক্ষার বই হল 'স্বলাতে মুবাশ্‌শির' (দুই খন্ডে) লেখক আব্দুল হামীদ মাদানী। আপনি তা সংগ্রহ করে নিজের কাছে রাখুন। আল্লামা আলবানীর বই 'সিফাতু স্বলাতিন্নাবী'র বঙ্গানুবাদ বাজারে পাওয়া যাচ্ছে, সেটাও আপনি নিজ সংগ্রহে রাখতে পারেন।

মনে রাখবেন, সমাজে প্রচলিত শরীয়ত বিরোধী বহু আমলের প্রতিবাদ করলে অনেকে আবার বলেন, 'কম্বলের রোঁয়া বাছতে বাছতে সব শেষ' এরা মনে হয় এক

দিন নামায-রোযাও রাখবে না, ইত্যাদি।

ঘটনা কিন্তু তা নয়। আমাদের দেশে আলিমগণের গাফলতির জন্য এবং প্রকৃত জ্ঞানচর্চা না থাকার পরিণামে বহু এমন বিষয় ইসলামে তথা মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে যার আসল ইসলামের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং সহীহ প্রমাণ মোতাবিক আপনার ইবাদত যদি না হয়, তাহলে পরকালে আপনাকে শূন্য হস্তে উঠতে হবে। আর পরিণতি হবে ভয়াবহ। আল্লাহ আমাদেরকে সত্য পথে পরিচালিত করুন। আমীন!

ফরয স্বলাত শেষে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দুআ করার দলীলসমূহ ও সেগুলির অসারতা

যে সমস্ত আয়াত ও হাদীসসমূহকে কেন্দ্র করে ফরয স্বলাত শেষে হাত তুলে সম্মিলিত দুআর জন্য ওকালতী করা হয় তা হল নিম্নরূপ ঃ-

(১) মহাঃ মাঝহারুল ইসলাম তাঁর রচিত বই 'প্রশ্নোত্তরে ফরয নামাযের পর দোওয়া'তে সূরা ইনশিরাহ আয়াত ৭-৮ এর বরাতে বলতে চেয়েছেন যে, এখানে স্বলাত শেষে দুআ করার নির্দেশ আল্লাহ তাঁর নবীকে দিয়েছেন। দলীলে তাফসীরে জালালাইনের বরাত দিয়েছেন। এখানে উল্লেখ যে তাফসীরে জালালাইন আদৌ কোন তাফসীরের নির্ভরযোগ্য বই নয়। মূলতঃ বইখানি ছাত্রদেরকে আভিধানিক অর্থ শেখানোর জন্য পড়ানো হয়। তাফসীর প্রথমতঃ কুরআনের দ্বারা হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ সহীহ হাদীস দ্বারা হতে হবে। তৃতীয়তঃ সাহাবীগণের উক্তি দ্বারা হতে হবে। তিনি যে ব্যাখ্যা এনেছেন, তা এর কোনটির দ্বারা প্রত্যয়িত নয়। সুতরাং আয়াতটি দ্বারা যে অর্থ গ্রহণ করেছেন সেটা ঠিক নয়। কারণ, পুরো স্বলাতটাই তো দুআ। দুআ হতে ফারেগ হয়ে দুআতে লেগে যাওয়ার অর্ডার আবার কি ধরনের? ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) এই তাফসীরকে অদ্ভুত ও দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। *(দ্রষ্টব্য ফতোয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ ২২ খন্ড ৪৯৬- ৪৯৮ পৃঃ, দুআ করুন, বিদআত হতে বাঁচুন, শায়খ আবুল কাসিম জঙ্গীপুরী ২ খন্ড ৫৫ পৃঃ)*

উক্ত আয়াতের তাফসীর হাফিয ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর লিখেছেন,

إذا فَرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها، فانصب في العبادة، وقم إليها نشيطا

فارغ البال، وأخلص لربك النية والرغبة. .....

قال مجاهد في هذه الآية: إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة، فانصب لربك، وفي رواية عنه: إذا قمت إلى الصلاة فانصب في حاجتك، وعن ابن مسعود: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. وعن ابن عياض نحوه. وفي رواية عن ابن مسعود: { فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ } بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس.

وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: { فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ } يعني: في الدعاء.

وقال زيد بن أسلم، والضحاك: { فَإِذَا فَرَغْتَ } أي: من الجهاد { فَانْصَبْ } أي: في العبادة. { وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ} قال الثوري: اجعل نيتك ورغبتك إلى الله، عز وجل.

উক্ত ইবারতের সারনির্যাস হল, তুমি যখন পার্থিব ব্যস্ততা হতে অবসর পাবে তখনই তুমি ইবাদতে মগ্ন হবে। পরিপূর্ণরূপে একাগ্রতার সাথে নির্ভেজাল নিয়্যাতের মাধ্যমে আল্লাহর আরাধনায় মগ্ন হবে।---

মুজাহিদ বলেন, দুনিয়ার ব্যস্ততা হতে অবসর পাওয়া মাত্র স্বলাতের জন্য দাঁড়িয়ে যাও এবং রবের জন্য দন্ডায়মান হয়ে যাও। ইবনে মাসউদ ﷺ-এর মতে, ফরয ইবাদত হতে অবসরপ্রাপ্ত হলে রাত্রির ইবাদতে মগ্ন হও। অন্য বর্ণনায়, ফরয স্বলাত শেষে বসে আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত হয়ে যাও।

যাহ্হাক বলেন, জিহাদ হতে ফারেগ হলে, ইবাদতে আত্মনিয়োগ কর। সাওরীর মতে এর অর্থ হল, তোমার নিয়্যাত ও চাহিদাকে পূর্ণরূপে আল্লাহ অভিমুখী কর।

এতগুলো তফসীর থাকা সত্ত্বেও নির্ভযোগ্য নয় এমন এক তফসীরের কথাগুলি শুধুমাত্র নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই গ্রহণ করা হয়েছে। 'সালাতে হাকীম ঃ দোয়ায়ে হাকিম'এর লেখক জনাব আব্দুল হাকীম সাহেব তাঁর বইয়ের ৪৩ পৃষ্ঠাতে পূর্ববর্তী লেখকবৃন্দের অন্ধ অনুকরণে একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন। তাফসীর জালালাইন ছাড়া অন্য তাফসীর পড়ে দেখার ভাগ্য মনে হয় এঁদের হয়নি। ছাত্র জীবনে তো নয়ই, পরে সরকারের গোলামী করতে গিয়ে আল্লাহর গোলামী ভুলে গেছেন।

যদি তাঁরা যেটা বুঝেছেন সেটাই আয়াতের অর্থ ও উদ্দেশ্য হয়, তাহলে নবী ﷺ ও সাহাবা কেরাম ﷺ সেটা বুঝেননি বা বুঝতে পারেননি। (নাউযুবিল্লাহ) কেননা তাঁদের জীবনের সমগ্র ফরয নামায শেষে কথিত ওই সম্মিলিত দুআর কোন স্পষ্ট প্রমাণ নেই।

তর্কের খাতিরে তাঁদের (উক্ত তাফসীরের) কথা মেনে নিলেও আয়াতে কোথায়

কিভাবে জামাআতবদ্ধভাবে দুআ প্রমাণিত হচ্ছে? সেটা নিরপেক্ষ-পাঠকবৃন্দ বিচার করবেন। স্বলাত (নামায) পড়ার বহু দুআ (দুআয়ে মাসূরা) রসূল ﷺ হতে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলি নিঃশব্দে ও সংগোপনে পড়তে হবে; সশব্দে অথবা জামআতবদ্ধভাবে নয়। সাধারণ স্বলাত সম্পর্কিত বইসমূহ হতে জনসাধারণ মুখস্থ করে নিতে পারেন।

(২) 'সালাতে হাকিম ঃ দোয়ায়ে হাকিম'-এর ৩০ পৃষ্ঠা এবং 'প্রশ্নোত্তরে ফরয নামাযের পর দোওয়া'র ২২ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আবু উমামাহ হতে বর্ণিত হাদীস, যার ভাবার্থ হল, রাত্রের শেষাংশে এবং ফরয স্বলাতসমূহের শেষে দুআ বেশী করে গৃহীত হয়। এক প্রশ্নের জবাবে আল্লাহর রসূল ﷺ এ কথা বলেছেন বলে হাদীসটিতে বলা হয়েছে।

পাঠক ভাই সকল! লক্ষ্য করুন হাদীসটিতে ফরয স্বলাত শেষে সম্মিলিত দুআর কোন কথাই নেই। স্বলাত শেষে চুপিসারে একাকী দুআর আমরা বিপক্ষে নই। মূল ঝগড়া হল ফরয স্বলাত শেষে হাত তুলে সম্মিলিত দুআকে নিয়ে। তাছাড়া হাদীসটি সহীহ নয়। এর সানাদ চরম বিতর্কিত। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান বলে মন্তব্য করলেও এটা তাঁর নিজস্ব নিয়ম যে, তিনি যয়ীফ হাদীসকে তার সমর্থনে কোন হাদীস থাকলেই হাসান বলে আখ্যায়িত করেন। আল্লামাহ আব্দুর রহমান মুবারাকপুরী (রহঃ) তাঁর গ্রন্থ তুহফাতুল আহওয়াযী ২১ খন্ড ৮২ পৃষ্ঠাতে ইমাম তিরমিযীর এই নীতির কথা উল্লেখ করে বলেন, তিরমিযী (রহঃ) শাওয়াহিদ বা সমর্থক কোন বর্ণনা থাকলে 'যয়ীফ' হাদীসকে 'হাসান' বলে মন্তব্য করেছেন।

উক্ত হাদীসের প্রতি মন্তব্য করতে গিয়ে উবাইদুল্লাহ রহমানী মুবারাকপুরী রহঃ বলেন,

والترمذي قد يحسن الحديث الضعيف لشواهده.

অর্থাৎ, তিরমিযী (রহঃ) শাওয়াহিদ বা সমর্থক কোন বর্ণনা থাকলে 'যয়ীফ' হাদীসকে 'হাসান' বলে মন্তব্য করে থাকেন।

উক্ত হাদীসের প্রতি মন্তব্য করতে গিয়ে উবাইদুল্লাহ রহমানী মুবারকপুরী (রঃ) বলেন,

رجاله ثقات، إلا ابن جريج مدلس، وقد رواه عن عبد الرحمن بالعنعنة، وأيضاً في عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة كلام.

অর্থাৎ, এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য হলেও হাদীসটির সানাদে একজন বর্ণনাকারী ইবনু জুরাইজ আছেন, যিনি হলেন 'মুদাল্লিস' রাবী। (মুদাল্লিস সেই বর্ণনাকারীকে বলা হয়, যে এমন ব্যক্তির নাম নিয়ে হাদীস বর্ণনা করছে যাকে দেখে থাকলেও আসলে

তার কাছে হাদীসটি শোনেনি।) তাছাড়া এই হাদীসটির সানাদে উল্লেখিত আব্দুর রহমান বিন সাবিত্বের আবু উমামাহ হতে শ্রবণ প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে বিতর্ক আছে।

তিনি হাফেয ইবনে হাজারের 'ইস্বাবাহ' গ্রন্থের ৩য় খন্ড ১৪৮ পৃষ্ঠা হতে তাঁর উক্তি নকল করেছেন যে, আব্দুর রহমান বিন সাবিত্ব একজন তাবেয়ী, অত্যাধিক মুরসাল হাদীস বর্ণনা করেন।

ويقال: لا يصح له سماع من صحابي، أرسل عن النبي ﷺ كثيراً.

আর বলা হয়, তাঁর কোন সাহাবী হতে হাদীস শ্রবণ প্রমাণিত নয়। তিনি সরাসরি নাবী ﷺ-এর নাম নিয়ে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। *(মিরআতুল মাফাতীহ ৩য় খন্ড ৩২ পৃঃ)*

(৩) 'প্রশ্নোত্তরে ফরয নামাযের পর দোওয়া' বইয়ের ২৩ পৃষ্ঠা ও 'সালাতে হাকিম ঃ দোয়ায়ে হাকিম' বইয়ের ৪১ পৃষ্ঠাতে ফাতহুলবারী ১১ খন্ড ২৪০ পৃষ্ঠার বরাতে হাবীব বিন মাসলামাহ ফেহরীর ﷺ দ্বারা বর্ণিত হাদীসটি যয়ীফ। *(দ্রষ্টব্য ঃ- যয়ীফ তারগীব, নাসিরুদ্দীন আলবানী ১/৭০)* তাছাড়া হাদীসটি সমষ্টিগত দুআ করার কথা প্রমাণ করে, ফরয নামায শেষে সম্মিলিত দুআ অবশ্যই নয়। কিন্তু হায় কপাল দুআপন্থী ইমামদের যে, হাদীসটি যয়ীফ হওয়ার জন্য দলীল যোগ্য নয়। উল্লেখ্য যে, 'সালাতে হাকিম'-এর লেখক আবু হুরাইরাহর যে হাদীসটি ফাতহুল বারী হতে (১১/২৪০) নকল করেছেন তাতে স্বলাত পরিচালনায় রত ইমাম (সূরাহ ফাতিহার শেষে) 'আমীন' বললে মুক্তাদীর 'আমীন' বলার কথা বলা হয়েছে। এ কথা প্রথমে লিখলেও পরে ফরয স্বলাত শেষে সম্মিলিত দুআর মর্ম উদ্ধার করেছেন সেটা অভিনব। সত্যি!! এমনভাবে মাসআলার 'ইসতিখরাজ' না হলে পৃথিবীতে বিদআত বলে কোন কিছু বাকী থাকবে না যে।

সম্মানিত পাঠক! ফাতহুল বারী 'বুখারী'র ভাষ্যগ্রন্থ; 'সহীহ বুখারী' নয়। এতে বহু যয়ীফ ও আপত্তিকর হাদীস এসে গেছে। সেজন্য লেখকের 'ফাতহুল বারী শারাহ সহীহ বুখারী' দ্বারা ধোকা খাবেন না।

(৪) 'জাফার বিন মুহাম্মাদ সাদেক বলেন, নফল ইবাদতের পরে দুআ করার তুলনায় ফরয ইবাদতের পরে দুআ করাটা উত্তম। *(ফাতহুল বারী ১১ খন্ড ১৬০, প্রশ্নোত্তরে ফরয নামাযের পর দোওয়া ২২পৃঃ, সালাতে হাকিম ৪০ পৃঃ)*

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! ইনসাফের সাথে বলুন! এখানে ফরয স্বলাত শেষে সম্মিলিত দুআর কথা কিভাবে বা কোথায় বলা হয়েছে? আর ফরয ইবাদত শুধু কি ফরয স্বলাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ? সিয়াম, যাকাত, হজ্জ্ব এবং হালাল জীবিকার খোঁজ ইত্যাদি

কি ফরয ইবাদত নয়? আমি প্রথমেই বলেছি, মানুষের গোলামী করে আল্লাহর গোলামী করা যায় না। সারা জীবন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অংশ বিশেষ পঠন-পাঠনের মাধ্যমে সহীহ ইল্‌ম অর্জন করা সম্ভব নয়। আল্লাহ এ ধরনের লোকেদেরকে আগেই মাহরুম করে দিয়েছেন।

(৫) আসওয়াদ আমেরী তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পিতা বলেছেন আমি রসূলুল্লাহর ﷺ সাথে ফজরের স্বলাত আদায় করেছি। তিনি যখন সালাম ফেরালেন তখন ফিরে বসলেন এবং হাত দুটি উঠালেন ও দুআ করলেন।

বর্ণিত হাদীসটি নির্ভরযোগ্য ও সহীহ হলে, ফরয নামায শেষে (একাকী হাত তুলে) দুআ করার এটা প্রকৃত দলীল হিসাবে গণ্য হত। কিন্তু হায়! যারা পরের মুখে ঝাল খেয়ে হুস হুস করেন, তারা কি করে ঝালের স্বাদের রহস্য উপলব্ধি করবেন!!

এই হাদীসটিকে দলীল হিসাবে যাঁরা দেখেন, তাঁরা মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহর হাওয়ালা দিয়ে থাকেন। আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারাকপুরী এই হাদীস নকল করার পর বলেন,

رَوَاهُ اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ، كَذَا ذَكَرَ بَعْضُ الْأَعْلَامِ هَذَا الْحَدِيثَ بِغَيْرِ سَنَدٍ وَعَزَاهُ إِلَى الْمُصَنِّفِ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى سَنَدِهِ فَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ كَيْفَ هُوَ صَحِيحٌ أَوْ ضَعِيفٌ .

অর্থাৎ, এটি বর্ণনা করেছেন ইবনু আবী শাইবাহ তাঁর 'মুসান্নাফ' নামক গ্রন্থে। কিছু বড় বড় আলিম বিনা সানাদে মুসান্নাফের বরাতে এভাবেই বর্ণনা করেছেন। আমি তার সানাদ সম্পর্কে অবগত হতে পারিনি। তাই সেটি যয়ীফ না সহীহ তা আল্লাহ তাআলই ভাল জানেন। *(তুহফাতুল আহওয়াযী ১ম খন্ড ২৪৬ পৃঃ)*

এর দ্বারা এটা স্পষ্ট যে, আবুল উলা আব্দুর রহমান মুবারকপুরীর সংগ্রহে উল্লেখিত 'মুসান্নাফ' ছিল না। বর্তমানে যে 'মুসান্নাফ' মুদ্রিতরূপে পাওয়া যাচ্ছে, তাতে উক্ত রাবীর নামসহ বর্ণিত হাদীসটি কোথাও নেই। 'আসমাউর রিজাল' গ্রন্থসমূহে আসওয়াদ আমেরী নামক তাবেয়ী ও তাঁর পিতা আমের নামক কোন সাহাবীর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। মুসান্নাফে এই মর্মে যে হাদীসটি পাওয়া যাচ্ছে, তার সানাদ এই ভাবে আছে।

حدثنا هشيم قال : نا يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد الأسود العامري عن أبيه قال : صليت مع رسول الله ﷺ الفجر فلما سلم انحرف.

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ ১/৩৩৭)

যাতে শুধু সালাম ফিরে মুক্তাদীগণের দিকে মুখ ফিরানোর কথা আছে।

হস্ত উত্তোলন ও দুআর উল্লেখ নেই। একই সানাদে এই মর্মের হাদীস, শব্দের কিছু পার্থক্যের সাথে সুনানে আবূ দাউদে আউনুল মা'বূদসহ ১/২৩৭, বাবুল ইনহিরাফ বা'দাস সালাম, সুনানে নাসাঈ, বাবুল ইনহিরাফ বা'দাত তাসলীম, সুনানে কুবরা বাইহাক্বী, বাবুল ইমামি য়্যানহারিফু বা'দাস সালাম - এ এইভাবে বর্ণিত হয়েছে,

صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ –ﷺ– فَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ انْحَرَفَ.

أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ –ﷺ– صَلاَةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا صَلَّى انْحَرَفَ.

যার অর্থ হল জাবির বিন ইয়াযীদ আসওয়াদ আমেরী তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সকালের (ফজরের) নামায পড়েছেন। যখন রসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফেরালেন তখন (মুক্তাদীদের দিকে) মুখ ফেরালেন। অতএব সহজেই বুঝা যাচ্ছে যে, হাদীসের অবস্থা সহীহ-যয়ীফ যাই হোক তাতে 'হাত তুললেন ও দুআ করলেন' এই বাক্য দু'টি নেই।

বলা বাহুল্য, এই ভুয়ো দলীল দ্বারা তথা কথিত দ্বীনের এই খাদেমদ্বয় কিভাবে জনগণকে প্রতারিত করে চলেছেন সেটা একমাত্র নিরপেক্ষ পাঠকবৃন্দ বিচার করবেন।

(৬) 'সালাতে হাকিম'-এর ৩৯ পৃষ্ঠা ও 'প্রশ্নোত্তরে ফরয নামাযের পর দোওয়া'-এর ২৪ পৃষ্ঠাতে উল্লেখিত, 'ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ বুখারীতে অধ্যায় রচনা করেছেন,

باب رفع الأيدي في الدعاء 'দুআতে হস্তোত্তোলনের অধ্যায়।'

অতএব ফরয স্বালাত শেষে হাত তোলার প্রমাণ হয়ে গেল। এ তো সেই প্রবাদটির মত, যাতে এক ক্ষুধার্তকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ২ আর ২ কত? উত্তর ছিল, ৪টি রুটি!

আরবীতে প্রবাদ আছে الغريق يتثبت بالحشيش (উর্দু প্রবাদে বলে, ডুবতে হুয়ে কো তিনকে কা সাহারা।) অর্থাৎ, ডুবন্ত ব্যক্তি ভাসমান খড় কুটো ধরে বাঁচতে চায়। বিতর্ক চলছে 'ফরয স্বালাত শেষে সম্মিলিত দুআ' করার, আর দলীল দেওয়া হচ্ছে সাধারণ দুআতে হাত তোলার। যে কোন মানুষ তার প্রয়োজনে হাত তুলে দুআ করতে পারে - এ বিষয়ে আলিমগণের কোন দ্বিমত নেই। আল্লাহ এই প্রকৃতির নাআহলে ইলমদের হতে আমাদের রক্ষা করুন। আমীন!

(৭) প্রশ্নোত্তরে ফরয নামাযের পর দোওয়া ৩৮ পৃষ্ঠা ও সালাতে হাকিম ৩৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে,

عن سلمان قال : قال رسول الله ﷺ: إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا.

(ফাতহুলবারী ১১ খন্ড ১৭২পৃঃ আবূ দাউদ হাদীস নং ১৪৮৮)

হাদীসের অর্থ হল, নিশ্চয় তোমাদের রব লজ্জাশীল-সম্মানিত। তিনি বান্দার হাতকে শূন্যাবস্থায় ফেরত দিতে লজ্জাবোধ করেন, যখন সে তার দিকে উত্তোলন করে।

আচ্ছা বলুন তো আব্দুল হাকীম সাহেব! উল্লেখিত হাদীসটিতে কি ফরয স্বলাত শেষে 'সম্মিলিত দুআ'র কোন তথ্য আছে? আপনি তো মাযহারুল ইসলাম সাহেবের রুহানী সাথী অথবা অন্ধ মুক্বাল্লিদ মনে হচ্ছে। দুজনে একবার আল্লাহকে সামনে রেখে চিন্তা করে দেখুন, আরাবী না জানা মানুষদের কিভাবে ধোকা দিয়ে চলেছেন। তার উপরে আপনারা দুজনেই রেজিস্ট্রার্ড শিক্ষক। জাতি আপনাদের উপর তাহলে কি করে আস্থা রাখবে? তওবাহ করুন! আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল দয়াবান।

(৮) প্রশ্নোত্তরে ফরয নামাযের পর দোওয়া ২৪ পৃঃ, সালাতে হাকিম এর ২২ পৃষ্ঠায় বিভিন্নভাবে বর্ণিত সহীহ বুখারীর বিখ্যাত একটি হাদীসকে নিয়ে এমন সব কারচুপি করেছেন যা করতে গিয়ে ইসলাম দুশমনদেরও হৃদয় প্রকম্পিত হবে। ইমাম বুখারী বাব বেঁধেছেন, 'বাবু রাফয়িন না-সি আয়দিয়াহুম মাআল ইমামি ফিল ইসতিসকা' অর্থাৎ, ইমামের সাথে জনসাধারণের বৃষ্টি কামনায় হস্তোত্তোলন করা। তারপরে হাদীসটি এনেছেন।

قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ أَتَى رَجُلٌ أَعْرَابِىٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَدْوِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ – ﷺ– يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ هَلَكَ الْعِيَالُ هَلَكَ النَّاسُ . فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ – ﷺ– يَدَيْهِ يَدْعُو ، وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ ، قَالَ فَمَا خَرَجْنَا مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى مُطِرْنَا ، فَمَا زِلْنَا نُمْطَرُ حَتَّى كَانَتِ الْجُمُعَةُ الأُخْرَى ، فَأَتَى الرَّجُلُ إِلَى نَبِىِّ اللَّهِ – ﷺ – فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بَشِقَ الْمُسَافِرُ ، وَمُنِعَ الطَّرِيقُ

আনাস বিন মালিক (রা) বলেন, একজন বেদুঈন রসূলুল্লাহর (সঃ) নিকট জুমআর দিনে এল। এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! চতুস্পদ প্রাণী, সন্তান-সন্ততি-পরিবার ও সাধারণ মানুষ ধ্বংস হয়ে গেল (আপনি বৃষ্টির জন্য দুআ করুন। রসূলুল্লাহ (সঃ) দুআর জন্য হাত উঠালেন এবং লোকেরাও হাত উঠিয়ে আল্লাহর রসূলের (সঃ) সাথে দুআ করতে লাগলেন। আমরা মসজিদ হতে বের হওয়ার পূর্বেই বৃষ্টি বর্ষণ হতে লাগল। নিরন্তর বৃষ্টি হতে হতে পরবর্তী জুমআহ এসে গেল। সেই ব্যক্তি (পুনরায়) নবী মুহাম্মাদ (সঃ)এর নিকটে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! (অতিবৃষ্টিতে) মুসাফির বিরক্ত হয়ে গেল ও রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল।

অন্যান্য বর্ণনায় বিশেষ করে 'বাবুল ইসতিসকায়ে ফিল খুত্বাতি ইয়াওমাল জুমুআতে' বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। তাতে বাড়তি কথা আছে যে, লোকটি যখন এসে উপস্থিত হয়, তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) খুত্বাহ দিচ্ছিলেন। দুআর পরে অবিরাম বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ার দরুন জীবজগৎ বিপন্ন হয়ে পড়লে পরবর্তী জুমআতে সেই লোকটিই এসে বৃষ্টি বন্ধের জন্য দুআর আবেদন করে। তাতে সাড়া দিয়ে তিনি তা বন্ধের জন্য দুআ করলে বন্ধ হয়ে যায়।

এই তো হল হাত তুলে দুআ করার প্রকৃত ঘটনা। ফরয স্বলাত শেষে সম্মিলিত দুআর বিপক্ষে যারা মত প্রকাশ করে চলেছেন, তাঁরা এই ঘটনা ও বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সহীহ হাদীসে বর্ণিত হাত তুলে দুআ করার ঘটনাকে অস্বীকার তো করেনই না; বরং এগুলিকে প্রমাণিত সুন্নত বলে মনে করেন। কিন্তু এটা যে ফরয স্বলাত শেষে সম্মিলিত দুআর দলীল নয়, তা এ জ্ঞানপাপীদেরকে কে বোঝাবে?

লেখকদ্বয় তাঁদের বইয়ে যে কারচুপি করেছেন তা হল, মাওলানা মাঝহারুল ইসলাম লিখেছেন, 'এবং সমস্ত লোকজনও নিজ নিজ হাত উঠিয়ে নবী (সঃ)এর সঙ্গে দোওয়াতে শরীক হয়ে আমীন আমীন বলতে লাগলেন। *(বুখারী ১ম খন্ড ১৪০ পৃঃ)* উক্ত হাদীস দ্বারা আম হিসাবে ফরয স্বলাত পরে দুহাত তুলে জামাআত সহকারে দোওয়া করা জায়েয প্রমাণিত হয় এবং হাদীসটি দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, দায়ী ছাড়া বাকী লোকজন দোওয়ার প্রতি আমীন বললেই সকলেরই দুআ হয়ে যাবে।'

কথিত আছে, আলিম ডুবলে সারা জাহান ডুবে। ভাই মাঝহারুল ইসলাম! আপনি নবী মুহাম্মাদের হাদীসে বাড়তি কথার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে নিজের পরকালকে ধ্বংস করতে চলেছেন। হাদীসে কোথায় আছে 'আমীন-আমীন' বলার কথা! হাদীসে তো আছে লোকেরাও রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে দুআ করছিলেন। আপনি বলেছেন, হাদীসটি আম (সাধারণ)। ঘটনা তো এটাই। আপনিও সেটাকে আম দুআর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখুন। এর দ্বারা খাস ফরয স্বলাত শেষে সম্মিলিত দুআ প্রমাণিত করছেন কেন? যে ইমাম বুখারী আম দুআতে হাত উঠানোর জন্য দলীল হিসাবে হাদীসটি 'বাবু রাফয়িল আইদী ফীদ্দুআ'তে এনেছেন, তিনিই 'বাবুদ্দুআয়ি বা'দা স্বালাহ'তে 'স্বলাতের পরে দুআ'তে এ হাদীসটি আনেননি; বরং যিকরের হাদীস এনেছেন। আপনি আল্লাহর রসূলের ﷺ জীবনের যে কোন ফরয স্বলাত শেষে সম্মিলিতভাবে হাত উঠানোর প্রমাণ হিসাবে শুধুমাত্র একটি সহীহ হাদীস পেশ করুন। কিয়ামত পর্যন্ত আপনাকে ও আপনার সহযোগীদেরকে সময় দেওয়া হল।

মাওলানা আঃ হাকীম সাহেব (তাঁকে আল্লাহ হিদায়াত দান করুন) তো কামাল করে

দিয়েছেন। পূর্বের সমস্ত লেখক যা না করতে পেরেছিলেন, তিনি তা করে দেখিয়েছেন। তিনি লিখেছেন,

(ক) **'লোকটি তাঁকে বলে নাই যে, হে আল্লাহর রসুল! ঐ অসুবিধার জন্য দুআ করুন! এর প্রমাণ হাদিসে নাই।'**

এটা তাঁর মিথ্যা কথা অথবা অজ্ঞতার ফসল। মনে হয় তিনি পুরো বুখারী পড়েননি অথবা পড়তে গেলে 'বুখার' (জ্বর) আসে। আমি যতদূর দেখেছি, তাতে আনাস দ্বারা বর্ণিত এই হাদীসটি বিস্তারিত ও সংক্ষিপ্তভাবে ১৩টি স্থানে এসেছে। তাদের ক্রমিক নম্বর হল ৯৩২, ১০১২, ১০১৪, ১০১৫, ১০১৬, ১০১৭, ১০১৮, ১০১৯, ১০২৯, ১০৩০, ১০৩২, ৬৩৪১, ৬৩৪২।

এখানে উল্লেখিত হাদীসগুলির মধ্যে শুধুমাত্র চারটি হাদীস সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে দুআ করার অনুরোধের কথা ঐগুলিতে উল্লেখ করা হয়নি। অবশিষ্ট সব কয়টিতে দুঃখ্য-দুর্দশার কথা উল্লেখ করে দুআর জন্য অনুরোধের কথা স্পষ্টাকারে লিখা আছে।

(খ) তিনি লিখেছেন **'হাদীসটি আম। খুত্বায় হাত তুলে দুআ নাই। অতএব ফরয নামায শেষে মামুল সালাম ফিরে ইনহেরাফ করে।'**

এটা তাঁর বিকৃত মনের কথা। ফরয স্বলাত শেষের কথা হাদীসের কোথাও নেই। এতদসত্ত্বেও বইয়ের মূল্যায়ন করে মতামত পোষণকারী বড় বড় ডিগ্রীধারী হুজুররাও এমন ভিত্তিহীন কথাকে ঠিক বলে মন্তব্য করেছেন। (আল্লাহ হিদায়াত দাও)। ইমাম বুখারী (রহঃ) পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন, 'বাবুল ইস্তিস্কায়ি ফিল খুত্বাতি ইয়াউমাল জুমুআহ' নবী ﷺ খুত্বাহ অবস্থাতেই পূর্বমুখী হয়েই হাত তুলে দুআ করেছেন, দেখুন হাদীস নং ৯৩২ ও ১০১৮। অথচ তিনি লিখে ফেলেছেন **'খুত্বায় হাত তুলে দুআ নাই।'** আসলে রঙিন চশমা চোখে লাগালে পৃথিবীর সব কিছুই রঙিন মনে হয়। আসুন! একবার চোখের চশমা খুলে দেখুন ঃ-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتْ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُغِيثُنَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَغِثْنَا .... ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتْ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكْهَا عَنَّا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا .....

একদা মহানবী ﷺ জুমআর দিন দাঁড়িয়ে জুমআর খুতবা দিচ্ছিলেন। এক মরুবাসী

(বেদুঈন) উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! মাল-ধন ধ্বংস হয়ে গেল আর পরিবার পরিজন (খাদ্যের অভাবে) ক্ষুধার্ত থেকে গেল। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন।' তখন নবী ﷺ নিজের দুই হাত তুলে দুআ করলেন এবং লোকেরাও তাঁর সাথে দুআর জন্য হাত তুলল। ফলে এমন বৃষ্টি শুরু হল যে পরবর্তী জুমআতে উক্ত (বা অন্য এক) ব্যক্তি পুনরায় খাড়া হয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! ঘর-বাড়ি ভেঙে গেল এবং মাল-ধন ডুবে গেল। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য দুআ করুন!' মহানবী ﷺ তখন নিজের হাত তুলে পুনরায় বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার জন্য দুআ করলেন এবং বৃষ্টিও থেমে গেল। *(বুখারী ৯৩২, ৯৩৩, ১০১৩, ১০২৯, মুসলিম ৮৯৭নং, নাসাঈ, আহমাদ ৩/২৫৬, ২৭১)*

উল্লেখ যে এটি ইস্তিস্কার স্বলাত নয় বরং ইস্তিস্কায় (বৃষ্টি চাওয়ার) জন্য জামাতবদ্ধভাবে হাত তুলে দুআ করা।

একবার ভেবে দেখুন, যদি প্রচলিত মুনাজাত 'ফরয নামায শেষে মামুল সালাম ফিরে ইনহেরাফ করে' থাকত, তাহলে কি ঐ বেদুঈন খুতবা চলাকালে দুআর আবেদন জানাতেন? এবং আল্লাহর নবী ﷺ এবং সাহাবাগণ খুতবাতেই হাত তুলে দুআ করতেন?

(৯) সালাতে হাকিম ঃ দোয়ায়ে হাকিম এর ৪৩ পৃষ্ঠা এবং প্রশ্নোত্তরে ফরয নামাযের পর দোওয়ার ২৫ পৃষ্ঠাতে মূসা ও হারুন (আঃ)এর দুআ করা ও তা আল্লাহর নিকট গৃহীত হওয়ার দলীল দ্বারা ফরয স্বলাত শেষে সম্মিলিত দুআ প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। *(সূরা ইউনুস, আয়াত ৮৯)* বলা বাহুল্য, ৮৮ নং আয়াতে কিন্তু মূসা ﷺ-এর দুআর কথা বলা হয়েছে। যেহেতু দুজনের দুআ গৃহীত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সে জন্য দুজনেই দুআ করেছিলেন এটাই প্রমাণিত হয়। মূসা ﷺ দুআ করেছিলেন ও হারুন ﷺ 'আমীন' বলেছিলেন, এ কথা এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় না।

এতদসত্ত্বেও আমরা বলব যে, সাধারণ দুআতে হাত উঠানো ও অংশ গ্রহণকারীদের আমীন বলাটা প্রমাণ করার জন্য অতদূরে যেতে হবে কেন? আমাদের নবী ﷺ বিশেষ-বিশেষ প্রয়োজনে দুআ করেছেন ও সাহাবীগণও দুআ করেছেন এবং শেষে আমীনও বলেছেন। কিন্তু সে সব দ্বারা তো আর ফরয স্বলাত শেষে হাত তুলে জামাআতী দুআ প্রমাণিত হয় না। একস্থানের দলীল দ্বারা অন্য স্থান দখল করা যায় না।

(১০) ফরয স্বলাত শেষে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দুআ করার সব চাইতে মজবুত, বলিষ্ঠ ও অকাট্য দলীল হল সাহাবী আলা' ইবনল হাযরামীর তাঁর সঙ্গী যোদ্ধাদের নিয়ে দুআ করা। সালাতে হাকিম ঃ দোয়ায়ে হাকিম ৪৩ পৃষ্ঠা ও প্রশ্নোত্তরে

ফরয নামাযের পর দোওয়া ২৮ পৃষ্ঠা এবং শায়খ আলীমুদ্দীন নদীয়াবী প্রণীত 'কিতাবুদ্দুআ'র ৭৭ পৃষ্ঠাতে আছে,

فلما قضى الصلاة جثا على ركبتيه وجثا الناس، ونصب في الدعاء ورفع يديه وفعل الناس مثله حتى طلعت الشمس....

অর্থাৎ, (বাহরাইনের মুর্তাদ তথা ইসলামত্যাগীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে আলা' ইবনুল হাযরামী ও তাঁর সঙ্গী যোদ্ধাগণ পানিশূন্য মহা সংকটের সময়) ফজরের স্বলাত সমাপ্তির পর হাঁটু গেড়ে (বসে নয় দাঁড়িয়েও নয়) দুআতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন (সূর্যোদয় পর্যন্ত) এবং তাতে স্বীয় হস্তদ্বয় উঠিয়েছিলেন। (তাঁর সাথে থাকা) লোকেরাও অনুরূপ করেছিলেন। *(আল বিদায়াহ অননিহায়াহ ৬ খন্ড ৩৬১ পৃষ্ঠা)*

সানাদবিহীন এই ঐতিহাসিক ঘটনা কোন নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থের নয়। এটা ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের সংকলনগ্রন্থ 'আলবিদায়াহ' হতে গৃহীত সানাদযুক্ত বহু হাদীস বর্ণনাকারীদের দুর্বলতার কারণে পরিত্যাজ্য। আর এটা তো বিনা সানাদের একটি বিচ্ছিন্ন ও বিরল ঘটনা। তাছাড়া দুআ করার জন্য এক অভিনব পন্থার কথা এতে জানা গেল, তা হল 'হাঁটু গেড়ে বসা, পাছা তুলে, না পূর্ণ বসে এবং না খাড়া হয়ে। লেখকদ্বয় আশা করি দুআ করার এই পদ্ধতিকে মেনে নেবেন না। ফরয স্বলাত শেষে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দুআ করার পক্ষে সর্বপ্রথম এই ঘটনাকে ঢাল হিসাবে যিনি ব্যবহার করেছেন, তিনি হলেন শায়খ আলীমুদ্দীন নদিয়াবী মেহেরপুরী। তিনি স্বরচিত বই 'কিতাবুদ্দুআ'তে উক্ত ঘটনাকে উল্লেখ করার পর (পৃঃ ৭৭) লিখছেন 'শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেছেন,

ولو دعا الإمام والمأموم أحياناً عقيب الصلاة لأمر عارض لم يعد ذلك مخالفاً للسنة كالذي يداوم على ذلك.

'আর যদি ইমাম ও মুক্তাদীগণ কোন কোন সময়ে সালাতের পরে কোন কারণবশতঃ দুআ করে, তবে তা সুন্নাতের খেলাফ হবে না; ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে তা হামেশা করে।'

অতএব সব সময় ফরয সালাত পর সমবেতভাবে হাত উঠিয়ে দুআ করা সুন্নতের পরিপন্থী। তবে এটা সমস্ত পন্ডিতগণের ঐক্যমত্য যে, প্রয়োজনে সকলে মিলে সমবেতভাবে কোন কোন সময় হাত উঠিয়ে দুআ করা বৈধ নীতির অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহঃ) এ ব্যাপারে অতি সুন্দর ফায়সালা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

فليس كل ما يشرع فعله أحياناً تشرع المداومة عليه.

'সুতরাং যে আমল কোন কোন সময়ে শরীয়ত সম্মত, তা সদা সর্বদা করা শরীয়ত সম্মত নয়।'

যেমন আমীরুল মু'মেনীন ওমর (রাঃ) কোন কোন সময়ে ফরয সালাতে দুআয়ে ইসতিফতাহ জোরে জোরে পড়তেন, তাই বলে ঐরূপ সব সময় করতে না---- ইত্যাদি। *(কিতাবুদ্দুআ পৃঃ ৭৭-৭৮)*

শায়খ আলীমুদ্দীন (রহঃ)এর বই হতে এ পর্যন্ত নোট করার উদ্দেশ্য হল যে, আলা' ইবনুল হাযরামীর ফরয স্বলাত শেষে সাথীগণসহ হাত তুলে হাঁটু গেড়ে দুআ করাটা ছিল আকস্মিক বিপদ হতে উদ্ধার হওয়ার জন্য তাৎক্ষণিক ঘটনা। এখনও যদি কোন সামাজিক সংকট সৃষ্টি হয় যা দূরীকরণের জন্য দুআর প্রয়োজন হয়, তাহলে তাতে সম্মিলিত দুআর বৈধতার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। এটা তো রসূলের সুন্নতসম্মত। এমন বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলী দ্বারা বিশেষ ইবাদত ফরয স্বলাত যা নিয়মিত করা হয়, তাতে সম্মিলিত দুআ প্রমাণ হবে কি? যেখানে কোন বিশেষ নামাযকে সাধারণ নামাযের নিয়মে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। যেমন সূর্য গ্রহণের নামাযে প্রত্যেক রাকআতে একাধিক রুকু করা, ঈদায়েনের নামাযে তাকবীরে তাহরীমের পরে অতিরিক্ত তাকবীর বলা ইত্যাদি।

(১১) প্রশ্নোত্তর ফরয নামাযের পর দুআ ২৬ পৃষ্ঠা ও সালাতে হাকিম ঃ দোয়ায়ে হাকীম ১২ পৃষ্ঠাতে সংকলিত হাদীস, যা মূলতঃ তাফসীর ইবনে কাসীর হতে সংগৃহীত। সূরা নিসার ৯৭-১০০নং আয়াতের তাফসীরে ইবনু আবী হাতেমের বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসটির ভাবার্থ হল, রসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফেরার পর কিবলাহ মুখী হয়ে দু হাত তুলে দুআ করছিলেন,

اللهم خلص الوليد بن الوليد، وعياش بن أبي ربيعة، وسَلَمة بن هشام، وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا من أيدي الكفار.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! অলীদ ইবনুল অলীদ, আইয়াশ ইবনু আবী রাবীআহ সালামাতু ইবনু হিশাম এবং ঐ দুর্বল মুসলিমদের মুক্ত কর, যারা কাফেরদের হাত থেকে মুক্ত হতে কোন উপায় ও বের হওয়ার জন্য কোন পন্থা উদ্ভাবন করতে পারছেন না।

এই হাদীসটি সালাম ফিরার পর হাত তুলে দুআ করার কথা বলা হয়েছে। (ক) হাদীসটি সহীহ হলে বিশেষ সংকটকালীন দুআ বলে চিহ্নিত হত।

(খ) হাদীসটিতে মুক্তাদীগণের কোন কথা নেই। এতএব এর দ্বারা জামাআতী দুআ প্রমাণ হয় না।

(গ) পক্ষান্তরে হাদীসটি দু'দিক থেকে বর্জনীয় ঃ-

(এক) সানাদের দিক থেকে। কেননা, এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে আলী ইবনে যায়েদ বিন জাদআন যয়ীফ রাবী আছেন। হাফেয ইবনে হাজার তাকরীবুত্তাহযীব ২/৩৭ পৃষ্ঠাতে চতুর্থ স্তরের যয়ীফ বর্ণনাকারী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। আর তাহযীবুত্তাহযীব ৭/৩২৩ পৃষ্ঠাতে যা লিখেছেন তা হল, ইবনে সা'দ বলেছেন, তিনি জন্মান্ধ ছিলেন, বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি যয়ীফ হওয়ার কারণে তাঁর হাদীস দলীলযোগ্য নয়। সালেহ ইবনে আহমাদ তাঁর বাপ হতে বলেন যে, তাঁর নিকট হতে লোকেরা বর্ণনা করেছেন কিন্তু তিনি দুর্বল। ইমাম আহ্মাদ বলেন, কোন কাজের যোগ্য নন, হাম্বাল আহ্মাদ হতে বর্ণনা করেন যে, 'যয়ীফুল হাদীস'। মুআবিয়াহ বিন সালেহ ইয়াহয়্যা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি যয়ীফ। উসমান দারেমী ইয়্যাহয়্যাহ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি মযবূত নন। দূরী বলেন, দলীলযোগ্য নন, কোন কাজের নন। ইজ্লী বলেন, তিনি শিয়াদের অনুরক্ত ছিলেন, কোন অসুবিধা তাতে নেই, তাঁর হাদীস লিখা যেতে পারে। কিন্তু তিনি মযবূত নন। জাওযাজানী বলেন, হাদীসশাস্ত্রে অকেজো, মযবূত নন। আবু যুরআহ বলেন, মযবূত নন। আবু হাতিম বলেন, মযবূত নন। তাঁর হাদীস লিখা যেতে পারে কিন্তু তা দলীলযোগ্য নয়। তিনি অন্ধ ছিলেন এবং শিয়া মনোভাবান্ন ছিলেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, সত্যবাদী; কিন্তু এমন বিষয় বর্ণনা করেন, যা হতে অন্যরা বিরত থাকেন। ইমাম নাসাঈ বলেন, যয়ীফ। ইবনে খুযাইমাহ বলেন, তাঁর সৃতিশক্তি খারাবীর জন্য তার নিকট হতে দলীল নিই না। দারাকুত্বনী বলেন, তিনি কমজোর। সুলাইমান বিন হার্ব্ বলেন, তিনি হাদীসে হেরাফেরী করেন। আজ একভাবে হাদীস বলে পরের দিন ঐ হাদীসই অন্যভাবে বলতেন। ইয়াহয়্যাহ বিন সাঈদ বলেন, তিনি পরিত্যাক্ত। আরো বলেন, ওকে ছেড়ে দাও।

প্রিয় পাঠক! যাঁর বিরুদ্ধে সমস্ত হাদীস বিশারদগণ 'দুর্বল' বলে মন্তব্য করেছেন, এমন একজন বর্ণনাকারীর হাদীস কিভাবে দলীল যোগ্য হতে পারে?

মাওলানা মাঝহারুল ইসলাম সাহেব উক্ত বর্ণনাকারী সম্পর্কে নিজেই লিখেছেন যে, তিনি যয়ীফ। এভাবেই কি তিনি 'যয়ীফ ইসলাম' প্রচারার্থে ডিগ্রি অর্জন করেছেন? তিনি ইবনুল হুমাম হানাফীর ভক্ত সেজে যয়ীফ হাদীস ফাযায়েলে গ্রহণ যোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন। যেমনটি করেছেন মাওলানা আঃ হাকীম সাহেব তাঁর পুস্তিকার নবম পৃষ্ঠাতে। ইনশাআল্লাহ আমরা সে বিষয়ে পৃথক অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আব্দুল হাকীম সাহেব লিখেছেন 'নিশ্চয় আবূ হুরাইরাহ আরো আসহাবে সুফ্ফা যাঁরা তাঁর কাছে থাকতেন, তাঁরা হাঁ করে তাকিয়ে দেখেন নাই? তাঁদের হাতও তুলে ছিলেন।'

কি সুন্দর ইজতেহাদ! নিজের বিশ্বাসকে এভাবে যারা রঞ্জিত করে তাদের জন্যই তো আল্লাহ বলেছেন,

{إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} (২৮) سورة النجم

তারা তো শুধুমাত্র ধারণার অনুসরণ করে, অথচ ধারণার দলীল হিসাবে কোন মূল্য নেই। *(সূরা নাজম ২৮ আয়াত)*

আব্দুল হাকীম সাহেব আরোও লিখেছেন, **'অত বড় একজন মুহাদ্দিস জায়েযের (শাস্ত্র বিধান সম্মত) কথা উল্লেখ করেছেন কেন? নিশ্চয় তিনি সামগ্রিক চিন্তা ভাবনার অনুভূতিতে অনুধাবন করেছেন বলেই ঐ কথাটা ব্যাখ্যায় সংযোজন ঘটিয়েছেন। এ সম্বন্ধে উদ্ধৃত হাদীস যা তিনি এনেছেন তা তাঁর কাছে মনোনীত বলে মনে হয়।'** *(সালাতে হাকিম ১৩-১৪পৃঃ)*

ঐ বইয়ের ১৬ পৃষ্ঠায় আরো লিখেছেন, 'আরও জানা যায়, (ঐরূপ দোয়া) ফরয নামায বাদে দোয়ায় হাত তুলা নিষেধের হাদীস সাবেত বা সাব্যস্ত নয়। বরং ঐ রূপ দোয়া না করার যত হাদীস এসেছে তা সব যায়ীফ। তোহফাতুল আহ্‌বুযী ২৪৬ পৃঃ ৯ লাইন।'

সম্মানিত লেখক! আপনি যা করে নিজের দুনিয়া কামানোতে ব্যস্ত ছিলেন। তাতে বেশী করে মনোনিবেশ করলে বেশী করে অর্থ সমাবেশ ঘটত এবং মান-সম্মানও রক্ষা পেত। আপনার অবশ্যই এ কথা জানা আছে যে, জ্ঞানীর উপরে জ্ঞানী আছে। আল্লামা মুবারাকপুরী অবশ্যই বড় আলিম ছিলেন। তাই বলে তিনি সবার বড় ছিলেন না। তাছাড়া তাঁর কাছে হাদীসগুলি প্রমাণিত ছিল বলে যেটা আপনি অনুমান করেছেন সেটা আপনার জ্ঞানের দীনতাই প্রমাণ করে। কেননা, আপনি তুহ্‌ফার আরাবী না বুঝতে পেরে লিখে বসেছেন যে, 'হাত তুলে দুআ না করার হাদীস সাবেত বা সাব্যস্ত নয় --- না করার যত হাদীস এসেছে তা সব যায়ীফ।' আপনি যে তুহ্‌ফাতুল আহওয়াযীর (যাকে তোহফাতুল আহবুযী, লিখেছেন) ভাষা হতে উল্লেখিত অর্থ বুঝেছেন সে আরাবী লাইনগুলি হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ-

وَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ الْمَنْعُ عَنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ، بَلْ جَاءَ فِي ثُبُوتِهِ الْأَحَادِيثُ الضِّعَافُ.

অর্থাৎ, ফরয স্বলাতের পরে হাত তুলে দুআ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা (আল্লাহর রসূল ﷺ হতে) প্রমাণিত নয়। বরং তার প্রমাণে যয়ীফ হাদীসসমূহ এসেছে।

আপনার সপক্ষের আলিমগণ যা বলছেন, আমরাও তো তাই বলছি, ফরয স্বলাত শেষে হাত তুলে সম্মিলিত দুআ করার অর্থ সম্বলিত সমস্ত হাদীস যয়ীফ। আর যয়ীফ

হাদীস দ্বারা শরীয়তের কোন বিধান সাব্যস্ত হয় না। আপনি কেমন রসূলভক্ত যে, রসুলের নাম নিয়ে এমন কথা বলছেন, যা নিশ্চিত রূপে প্রমাণিত নয়!

কথা বলতে বলতে লক্ষ্যবস্তু হতে অনেক দূরে চলে এসেছি। ইতিপূর্বে সমালোচিত আবূ হুরাইরাহ ﷺ-এর হাদীস, যার সানাদ প্রায় ঐকমত্যের ভিত্তিতে যয়ীফ, যা আমরা তথ্য সহ লিখে দিয়েছি। এখন তার অপর আর একটি আপত্তিকর দিক তুলে ধরছি ঃ-

(দুই) অর্থের দিক থেকে গ্রহণযোগ্য এই জন্য নয় যে, অলীদ ইবনুল অলীদ, আইয়্যাশ বিন আবী রাবীআহ ইত্যাদি বিষয়ক হাদীসটি সহীহ বুখারীর ৯টি স্থানে এসেছে। হাদীস নম্বর ৮০৪, ১০০৬, ২৯৩২, ৩৩৮৬, ৪৫৬০, ৪৫৯৮, ৬৩৯৩, ৬৯৪০ এবং মুসলিমের হাদীস নম্বর ৬৭৫। যাতে উক্ত দুআ রুকু হতে উঠে পড়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

عن أبي هريرة : أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع فربما قال إذا قال : سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد : اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش بن ربيعة اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف " يجهر بذلك وكان يقول في بعض صلاته : " اللهم العن فلانا وفلانا" لأحياء من العرب حتى أنزل الله : {لَيسَ لَكَ مِنَ الأَمر شَيءٌ}. متفق عليه.

আবূ হুরাইরা رضي الله عنه বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন কারো জন্য দুআ অথবা বদ্দুআ করার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি রুকূর পরে কুনূত পড়তেন। তিনি বলতেন, "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ, রাব্বানা অলাকাল হাম্‌দ, হে আল্লাহ তুমি অলীদকে --- মুক্তি দাও।"

এটাই কুনুতে নাযেলাহ বা আপাতকালীন দুআ। আলী বিন যায়েদের সহীহ হাদীসের এই বর্ণনার বিরুদ্ধে হাদীসটি শুধু যয়ীফই নয় বরং 'মুনকার' হয়ে গেল। ইনসাফের সাথে বলুন! যত বড় আল্লামাই হোক না কেন যয়ীফ হাদীসের বিরুদ্ধে সহীহ হাদীস থাকলে তার উপরে আমল করতে বলতে পারবেন কি? আল্লাহ আমাদের বোধ শক্তি দিন। আমীন!

(১২) 'প্রশ্নোত্তর ফরয নামাযের পর দুআ, ২৩ পৃষ্ঠা ও সালাতে হাকিম-এর ১৪ ও ৩৮ পৃষ্ঠাতে জালালুদ্দীন সুয়ূতী 'ফাযযুল বিআ ফি রাফয়িল য়্যাদায়নি ফিদ্দুআ' নামক গ্রন্থ হতে নকল করা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ বিন ইয়াহয়্যাহ আসলামী বলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরকে দেখলাম, তিনি একজনকে দেখলেন নামায শেষ করার

আগেই হাত তুলে আছে। সুতরাং সে যখন নামায শেষ করল, তখন তিনি তাকে বললেন, আল্লাহর রসূল ﷺ নামায শেষ না করে হাত তুলতেন না। (ত্বাবারানী)

(ক) এখানে পরিষ্কার নয় যে, কোন্ স্বলাত ছিল; ফরয না নফল?

(খ) এর দ্বারা স্বলাত শেষে হাত তুলে দুআ প্রমাণ হয়; কিন্তু ফরয নামায শেষে হাত তুলে ইমাম-মুক্তাদী মিলে জামাআতী দুআ প্রমাণ হয় না।

(গ) হাফিয হাইসামী হাদীসটির বর্ণনাকারীদের 'সিক্বাতুন' (নির্ভরযোগ্য) বলেছেন। এতদ্সত্ত্বেও হাদীসটি সহীহ নয়। কেননা, তিনি যা বুঝেছেন তার ভিত্তিতে 'সিক্বাত' বলেছেন। বর্ণনাকারীদের দুর্বলতা একজনের দৃষ্টিগোচর না হলেও অন্যের কাছে তা ধরা পড়ে যায়। যেমন, চিকিৎসকও রোগ নির্ণয়ের ঘটনা দ্বারা এটা বুঝা সম্ভব। অনুরূপভাবে অন্যের কাছে এর দুর্বলতা প্রমাণিত হওয়ার কারণে হাদীসটি যয়ীফ। সে কারণেই শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন,

وقال الهيثمي : ورجاله ثقات. قلت : وفيه نظر من وجهين.

হাইযামী বলেছেন, 'এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।' আমি বলছি, তাঁর এই বলার উপর দু'দিক দিয়ে আপত্তি আছে; ইবনে মায়ীন বলেছেন, ফুযাইল ليس بثقة হাফেয ইবনে হাজার বলেছেন, صدوق له خطأ كثير যাহাবী বলেছেন, فيه لين সুতরাং হাদীসটি যয়ীফ। *(বিস্তারিত দেখুনঃ সিলসিলাহ যয়ীফাহ ২৫৪৪নং)*

(ঘ) 'ফাতাওয়া নাযীরিয়্যাহ, যেখান হতে তাঁরা হাদীসটিকে নকল করছেন সেখানেই হাদীসটিকে যয়ীফ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর পরেও তাঁরা বিভ্রান্ত করার জন্য কিভাবে নকল করে চলেছেন।

(১৩) ফাতাওয়া সানাইয়্যাহ ১ম খন্ড ৫০৬ পৃষ্ঠা ও প্রশ্নোত্তরে ফরয নামাযের পর দোওয়া ২৮-পৃষ্ঠায় নকল করা হয়েছে যে,

عن أنس عن النبي ﷺ أنه قال : ما من عبد يبسط كفه في دبر صلاته ثم يقول اللهم إلهي وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله جبريل وميكائيل وإسرافيل أسألك أن تستجيب دعوتي فإني مضطر وتعصمني في ديني فإني مبتلى وتنالني برحمتك فإني مذنب وتنفي عني الفقر فإني مستمسك (مسكين) إلا كان حقا على الله أن لا يرد يديه خائبتين.

আনাস رضي الله عنه নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, কোন বান্দা যদি প্রত্যেক নামাযের শেষে নিজের হাতের তালু দুটোকে বিছিয়ে দিয়ে বলে হে আল্লাহ! ---- তাহলে আল্লাহর জন্য এটা অবধারিত হয়ে যায় যে, তার হাত দুটোকে তিনি আশাহত করে ফেরৎ দেন

না।

ইবনে সুন্নীর আমালুল ইয়াওমি অল লাইলাহ ৪৯ পৃষ্ঠা হতে সংকলিত এই হাদীসটি যে যয়ীফ, সাইয়িদ নাযীর হোসাইন স্বয়ং তা উল্লেখ করেছেন। *(ফাতাওয়া নাযীরিয়্যাহ ১ম খন্ড ২৬৬ পৃঃ ফাতাওয়া সানাইয়্যাহ য়ম খন্ড ৫০৬ পৃঃ)* হাদীসটিকে আল্লামা মুহাম্মাদ ত্বাহের আল-হিন্দী তাঁর গ্রন্থ 'তাযকিরাতুল মাউযূআত ১/৫৮ তে উল্লেখ করেছেন। ইবনে সুন্নীর মুহাক্কিক্ব বলেন, যয়ীফ। *(হাদীস নং ১৩৮)*

(ক) এই হাদীস সম্পর্কে কানযুল উম্মাল-এর লেখক ১/ ১৮৩ পৃঃতে লিখেছেন,

(ابن السنى وأبو الشيخ والديلمي كر وابن النجار عن أنس) وهو واه.

যার মর্মার্থ হল, আনাস থেকে বর্ণিত হাদীসটি 'অচল'।

এর সানাদে আঃ আযীয বিন আঃ রহমান কুরাশী নামক একজন বর্ণনাকারী আছে যার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন, সে অপবাদগ্রস্ত। ইবনে হিব্বান বলেন, আমি

عمرو بن سنان عن إسحاق بن خالد البالسي عن عبد العزيز بن عبد الرحمن

এর সানাদ দ্বারা বর্ণিত উল্টা-পাল্টা শত হাদীসের একটি পুস্তিকা লিপিবদ্ধ করেছিলাম, যার কোন ভিত্তি নেই। আর সেগুলি থেকে দলীল সংগ্রহ কোন মতেই জায়েয নয়। ইমাম নাসাঈ বলেন, নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ নুআইম ইসবাহানী বলেন, তার কাছে থেকে 'মুনকার' বর্ণনা করা হয়েছে। *(লিসানুল মীযান ৪/৩৪ পৃঃ, মীযানুল ই'তিদাল ২/ ১৩৭ পৃঃ)*

এই সানাদের ২য় বর্ণনাকারী খাসীফ সম্পর্কে হাফেয ইবনে হাজার তাহযীবুত্তাহ্যীব ৩/ ১৪৪ পৃষ্ঠাতে বলেন, 'আবূ তালেব আহমাদ থেকে বর্ণনা করেছেন 'খাসীফ যয়ীফুল হাদীস।' হাম্বাল বলেছেন 'সে দলীল যোগ্য নয় এবং হাদীসে মযবুত নয়। আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, সে হাদীসে মযবূত নয়। কখনো বলেছেন, খাসীফ মুসনাদে অত্যন্ত গন্ডগোলে ব্যক্তি। ইবনে মায়ীন বলেন, ওর মধ্যে কোন অসুবিধা নেই। কখনও বলেছেন, নির্ভরযোগ্য। আবূ হাতিম বলেন, ভাল; কিন্তু তার সব গোলমাল হয়ে গেছে এবং তার হিফ্য শক্তি খারাব হওয়া নিয়ে অনেকের অভিযোগ আছে। নাসায়ী বলেন, আত্তাব মখবুত নয়, খাসীফও নয়। কখনও বলেছেন, 'ভাল' ইত্যাদি। এ ছাড়া অনেকে অনেক মন্তব্য করেছেন।

প্রিয় পাঠক! এত গোলমেলে ও ভেজাল হাদীস থেকে যাঁরা নিজেদের ইবাদতের দলীল সংগ্রহ করেন, তাঁরা কোন্ পর্যায়ের মানুষ সেটা সহজেই অনুমান করতে পারছেন।

দুনিয়ার ব্যাপারে ভাল চাকুরী, ভাল গাড়ি, ভাল বাড়ি, ভাল যন্ত্র ইত্যাদি কামনা

করেন, আর দ্বীনের ব্যাপারে উল্টা-পাল্টা যা পাবেন তা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করবেন। বাঃ রে দ্বীনদার !

(খ) তাছাড়া এতে জামাআতী দুআর কোন উল্লেখ নেই।

(১৪) 'সালাতে হাকিম ঃ দোয়ায়ে হাকিম' পুস্তিকার ১৫ পৃষ্ঠায় লেখক একটি হাদীসের শেষাংশকে উল্লেখ করেছেন। পূর্ণ হাদীসটিকে উল্লেখ করলে পাছে তাঁর খিয়ানত ধরা পড়ে যায়। তাতে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, যদি কেউ স্বলাত শেষে হাত তুলে দুআ না করে, তাহলে স্বলাত অসম্পূর্ণ। অথচ লেখক নিজেই তাঁর এই উপস্থাপিত মাসআলাহর বিরুদ্ধে ৩৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'তবে সকলকে মনে রাখতে হবে, দোয়া নামাযের অঙ্গ নয়।'

হাদীসটিকে পূর্ণরূপে পাঠ করুন ঃ-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى ، تَشَهُّدٌ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَخَشُّعٌ وَتَضَرُّعٌ وَتَمَسْكُنٌ ثُمَّ تُقْنِعُ يَدَيْك، يَقُولُ تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّك مُسْتَقْبِلًا بِبُطُونِهِمَا وَجْهَك وَتَقُولُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ كَذَا وَكَذَا ، وَفِي رِوَايَةٍ : فَهُوَ خِدَاجٌ.

অর্থাৎ, স্বলাত হচ্ছে দু' রাকআত দু' রাকআত। প্রত্যেক দু' রাকআতে রয়েছে তাশাহহুদ। আর তাতে থাকবে বিনম্রতা, অনুনয়-বিনয় ও দীনতা। অতঃপর তুমি নিজের হাত দু'খানাকে স্বীয় প্রতিপালকের দিকে উত্তোলন করবে, যাতে হাতের তালু দু'খানি তোমার মুখমন্ডলের সামনে থাকবে। তুমি তাতে বলবে, হে রব! হে রব! কেউ যদি এ রকম না করে, তাহলে তা এমন এমন। অন্য বর্ণনায় স্পষ্ট এসেছে, তা অসম্পূর্ণ।

এবারে আব্দুল হাকিম সাহেবের অনুবাদ পড়ুন, (নামায হচ্ছে দু' রাকআত দু' রাকআত। প্রত্যেক দু' রাকআতে রয়েছে তাশাহহুদ --) যখন (নামায পড়ে শেষ করে সালাম ফিরবে) তারপর তোমার প্রয়োজনের জন্য হাত তুলে (আল্লাহর সমীপে) বলবে, হে আমার পালনকর্তা, হে আমার পরোয়ারদেগার!--- কেউ যদি এ রকম না বলে, না করে (নামাযের ভিতরে যা যা বলেছে) তা নাকেস, তা অসম্পূর্ণ। *(ঐ ১৫-১৬পৃঃ)*

(ক) প্রিয় পাঠক! শুধুমাত্র দু' দু' রাকআত করে স্বলাত একমাত্র নফল স্বলাত হতে পারে; ফরয স্বলাত নয়। অথচ তা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে উল্লেখ করা হয়নি। দ্বিতীয়তঃ এখানে জামাআতের কথারও উল্লেখ নেই।

(খ) হাদীসের মধ্যে কোথাও সালাম ফিরার কথা নেই। (ওটি হাদীসের ব্যাখ্যাকারীর নিজের মনের কথা।) সে জন্য আল-ইরাক্বী বলেছেন, হতে পারে যে, এখানে হাত

তোলা বলতে ফজরের নামাযের কুনূতে অথবা বিত্‌র নামাযের কুনূতে। *(আউনুল মা'বূদ ৩/২৪৬)*

(গ) হাদীসের অর্থানুযায়ী সালাম ফিরার পর কেউ যদি হাত তুলে মুনাজাত না করে, তাহলে তার স্বলাত অসম্পূর্ণ। যেমন সূরা ফাতিহা না পড়লে যা হয়! আপনি কি মনে করেন?

(ঘ) যে তুহফাতুল আহওয়াযীর মুসান্নিফের প্রশংসায় আব্দুল হাকিম সাহেব সাহিত্য রস পানে বিভোর হয়েছেন, হাদীসটি সম্পর্কে তাঁর অভিমত কি, সেটা একবার পড়ে দেখা যাক। তিনি লিখেছেন,

قُلْت : مَدَارُ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعِ بْنِ الْعَمْيَاءِ وَهُوَ مَجْهُولٌ عَلَى مَا قَالَ الْحَافِظُ . وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : لَمْ يَصِحَّ حَدِيثُهُ وَذَكَرَهُ اِبْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ .

আমি বলি, এ হাদীসটির নির্ভরস্থল হল, আব্দুল্লাহ বিন নাফে' বিন আমইয়া। আর সে অজ্ঞাত পরিচয় বর্ণনাকারী; যেমন হাফেয বলেছেন। বুখারী বলেছেন, তার হাদীস সহীহ নয়। আর ইবনে হিব্বান তাকে সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

এই হল একজন মুহাদ্দিসের আমানতদারী। অন্ততঃপক্ষে নিজে সহীহ-যয়ীফ জানতে না পারলেও বিশেষজ্ঞদের উক্তি নকল করে দেবেন। এটাকেই বলে, আমানাহ ইলমিয়্যাহ বা ইলমী আমানতদারী।

সুতরাং হাদীস যে সহীহ নয়, তা বুঝতেই পারছেন। এ শতাব্দীর আলোড়ন সৃষ্টিকারী মুহাদ্দিস আল্লামা আলবানী (রঃ)ও এটিকে 'যয়ীফ' বলেছেন। *(যয়ীফ তিরমিযী, যয়ীফুল জামে' ৩৫১২নং, মিশকাত ৮০৫নং)*

ফরয স্বলাতের পর হাত তুলে দুআর কোন হাদীস সহীহ নয় বলেই অপর পক্ষের সত্যানুসন্ধানী উলামাগণ ঐ দুআকে বিদআত বলেছেন।

আর ঐ দুআর খাস দলীল নেই বলেই তো ফরয স্বলাতের পর মুনাজাতের পক্ষপাতীগণ আরো অন্যান্য দলীল পেশ করে বলেন,

(ক) হাদীসে আমভাবে হাত তুলে দুআর ফযীলত এসেছে।

(খ) ফরয স্বলাতের পরে দুআর তারগীব (উৎসাহ)সূচক হাদীস এসেছে।

(গ) আল্লাহর নবী ﷺ ফরয স্বলাতের পর দুআ করেছেন ও করতে বলেছেন।

(ঘ) হাত তুলে দুআ করা দুআর একটি আদব। আল্লাহর নবী ﷺ হাত তুলে অনেক দুআ করেছেন।

(ঙ) ফরয স্বলাতের পর হাত তুলে দুআ করতে নিষেধ করা হয়নি। বরং যয়ীফ হাদীসে হাত তুলে দুআর কথা এসেছে।

(চ) আর ফাযায়েলে আ'মালে যয়ীফ হাদীস ব্যবহার করা যায়। ইত্যাদি।

(দেখুন ঃ 'প্রশ্নোত্তরে ফরয নামাযের পর দোওয়া ৪৩ ও ৫১ পৃষ্ঠা, 'সালাতে হাকিম ঃ দোয়ায়ে হাকিম ৩৫-৩৮ পৃষ্ঠা)

শায়খ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রঃ) উপরের যুক্তিগুলির পরে বলেছেন,

قَالُوا فَبَعْدَ ثُبُوتِ هَذِهِ الْأُمُورِ الْأَرْبَعَةِ وَعَدَمِ ثُبُوتِ الْمَنْعِ لَا يَكُونُ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ بِدْعَةً سَيِّئَةً بَلْ هُوَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ عَلَى مَنْ يَفْعَلُهُ.

অর্থাৎ, ফরয স্বলাতের পর মুনাজাতের পক্ষপাতীগণ বলেন, সুতরাং এই চারটি জিনিস প্রমাণের (?) পর এবং নিষেধ প্রমাণ না থাকার কারণে ফরয স্বলাতের পর দুআর জন্য হাত তোলা নিকৃষ্ট বিদআত হবে না। বরং তা জায়েয, যে করবে তার কোন দোষ হবে না।

এর কিছু পর মুবারকপুরী (রঃ) তাঁদের রায়ে রায় মিলিয়ে বলেন,

قُلْت : الْقَوْلُ الرَّاجِحُ عِنْدِي أَنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ جَائِزٌ لَوْ فَعَلَهُ أَحَدٌ لَا بَأْسَ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

অর্থাৎ, আমার নিকট 'রাজেহ' (প্রাধান্যযোগ্য অভিমত) এই যে, স্বলাতের পর দুআর জন্য হাত তোলা জায়েয। যদি কেউ করে, তার দোষ হবে না ইন শাআল্লাহু তাআলা। আর আল্লাহই অধিক জানেন।

এখানে খেয়াল করুন যে, এখানে বিভিন্ন প্রকারের ও স্থানের দলীলগুলিকে একত্রিত করে যৌগিকভাবে যা প্রমাণ করতে চাওয়া হয়েছে এবং যা সঠিক মত বলে ব্যক্ত করা হয়েছে তা হল, স্বলাতের পর দুআর জন্য হাত তোলা জায়েয। তাঁর ভাষাতে কোথাও সম্মিলিতভাবে ইমাম-মুক্তাদীর হাত তুলে দুআ করার কথা নেই। কেননা, তার কোন দলীল নেই।

মুবারকপুরী সাহেব 'জায়েয' বলেছেন, মুস্তাহাব বা সুন্নত বলেননি। অথচ আল্লাহর নবী ﷺ থেকে প্রমাণ থাকলে তো সুন্নত বা মুস্তাহাব হওয়ার কথা। তাই নয় কি? তাহলে এত বড় একজন মুহাদ্দিস এহতিয়াত ও সতর্কতার সাথে কেবল 'জায়েয' বললেন কেন? কেবল 'স্বলাতের পর দুআর জন্য হাত তোলা' জায়েয বললেন কেন? পরিষ্কারভাবে বিতর্কিত জামাআতী মুনাজাতকে 'সুন্নত, মুস্তাহাব' বা কমসে কম 'জায়েয' বললেন না কেন? দলীলে দম নেই বলেই তো? একজনের মাথা, একজনের পা, অপর জনের হাত জুড়ে তৈরী দেহ বলেই তো?

তাছাড়া আগেই বলা হয়েছে, নিষেধ না থাকলেই যে কোন ইবাদত যে কোন সময় করা যাবে, তা নয়। তাহলে তো অনেক নতুন নতুন ইবাদত আবিষ্কার করা যাবে। এই ধরুন ঃ-

(ক) আযান ও ইকামতের মাঝে হাত তুলে জামাআতী দুআ মুস্তাহাব হবে।

(খ) জুমআর দিনের যে কোনও একটি সময়ে দুআ কবুল হয়, সে সময়েও হাত তুলে জামাআতী দুআ করা মুস্তাহাব হবে।

(গ) সফর অবস্থায় অনুরূপ দুআ মুস্তাহাব।

(ঘ) রোযা অবস্থায় অনুরূপ দুআ মুস্তাহাব।

(ঙ) বৃষ্টি বর্ষণের সময় অনুরূপ দুআ মুস্তাহাব। ইত্যাদি।

যেহেতু উক্ত সময়গুলিতে দুআ কবুল হয়, হাত তোলা দুআর একটি আদব, জামাআতী দুআ কবুল হয়ে থাকে এবং ঐ সময় হাত তুলে দুআ করতে নিষেধ নয়।

আশা করি, তাঁরা এমনটি বলবেন না।

(১৫) 'সালাতে হাকিম' ৪৬পৃষ্ঠা ও 'প্রশ্নোত্তরে ফরয নামাযের পর দোওয়া' ১৯পৃষ্ঠায় আযরাক বিন ক্বায়েস হতে বর্ণিত একটি হাদীস দ্বারা উভয়েই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে,

'এই জন্যে আহলে কেতাবকে আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করেছিলেন। কারণ তারা নামাযের পর যিকির ও দুআতে সময় দিতেন না।'

(পড়ুন ঃ হাত তুলে দুআ করতেন না।) কিন্তু হাদীসের মূল ইবারতে এ ধরনের কোন বাক্য নেই। লেখকদ্বয় অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে হাদীসের অর্থে তাহরীফ করে আহলে কিতাবদের অভিশপ্ত চরিত্রের সুন্দর পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছেন!

এবার হাদীসের মূল আরাবী পড়ুন ঃ-

عَنْ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا إِمَامٌ لَنَا يُكْنَى أَبَا رِمْثَةَ فَقَالَ صَلَّيْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ أَوْ مِثْلَ هَذِهِ الصَّلَاةِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَقُومَانِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ عَنْ يَمِينِهِ وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ شَهِدَ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى مِنْ الصَّلَاةِ فَصَلَّى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى رَأَيْنَا بَيَاضَ خَدَّيْهِ ثُمَّ انْفَتَلَ كَانْفِتَالِ أَبِي رِمْثَةَ يَعْنِي نَفْسَهُ فَقَامَ الرَّجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ مَعَهُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى مِنْ الصَّلَاةِ يَشْفَعُ فَوَثَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهِ فَهَزَّهُ ثُمَّ قَالَ اجْلِسْ فَإِنَّهُ لَمْ يُهْلِكْ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلَوَاتِهِمْ فَصْلٌ فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ بَصَرَهُ فَقَالَ أَصَابَ اللَّهُ بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ.

যে শব্দগুলির নিচে দাগ লাগানো আছে, সেগুলিকে পড়ুন ও লক্ষ্য করুন যে, কিভাবে এগুলির অর্থে খিয়ানত করা হয়েছে!

হাদীসটির সংক্ষিপ্ত ও সঠিক অনুবাদ হল এই যে, আল-আযরাক বিন কাইস ﵁

হতে বর্ণিত, একদিন নবী ﷺ স্বলাতের সালাম ফিরেছেন, ঐ মুহূর্তে একজন সাহাবী সাথে সাথে সুন্নত পড়ার জন্য দাঁড়িয়েছেন। তৎক্ষণাৎ উমার ﷺ ঐ ব্যক্তির ঘাড় ধরে ঝাঁকানী দিয়ে বলেন, বসো! এই জন্যে আহলে কেতাবকে আল্লাহ তাআলা ধ্বংস করেছিলেন, কারণ তাদের স্বলাতসমূহের মধ্যে ব্যবধান থাকত না। তখন নবী ﷺ তাঁর দিকে দেখে বললেন, হে ইবনুল খাত্তাব! তোমার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা হক কথাই বলিয়েছেন। *(আবূ দাঊদ)*

(ক) এ হাদীসটি সহীহ নয়; বরং যয়ীফ। *(দেখুনঃ যয়ীফ আবূ দাঊদ)* কারণ, আশআস বিন শু'বা দুর্বল রাবী; যেমনটি ইমাম যাহাবী বলেছেন। সে যার নিকট হতে হাদীসটি গ্রহণ করেছে সে হচ্ছে মিনহাল বিন খলীফাহ, সেও যয়ীফ। ইবনে হাজার এমনই ইঙ্গিত করেছেন।

(খ) এতদ্‌সত্ত্বেও হাদীসটিতে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দুআর কোন প্রমাণ নেই।

(গ) উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে হাদীসটির অনুবাদ বিকৃত করা হয়েছে। উমার ﷺ-এর ঝাঁকানী ও আহলে কিতাবের ধ্বংসের উল্লেখিত কারণ অনুবাদে গোপন করে, মুনাজাত প্রমাণ করার জন্য **'তারা নামাযের পর যিকির ও দুআতে সময় দিতেন না।'** উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ তাদের ধ্বংসের কারণ ছিল, তাদের দুই স্বলাতের মধ্যে ব্যবধান থাকত না।

(ঘ) আসলে এ হাদীসটি ঐ হাদীসের অনুরূপ যা সহীহ মুসলিমের ৮৮৩, আবূ দাঊদ ১২২৯নং মুসনাদে আহমাদ ৪/৯৫, ৯৯ তে আছেঃ-

সায়েব বিন য়্যাযীদ বলেন, একদা আমি মুআবিয়া ﷺ এর সাথে (মসজিদের) আমীর-কক্ষে জুমআর স্বলাত আদায় করলাম। তিনি সালাম ফিরলে আমি উঠে সেই জায়গাতেই সুন্নত পড়ে নিলাম। অতঃপর তিনি (বাসায়) প্রবেশ করলে একজনের মারফৎ আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'তুমি যা করলে তা আর দ্বিতীয়বার করো না। জুমআর স্বলাত সমাপ্ত করলে কথা বলা অথবা বের হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তার সাথে আর অন্য কোন স্বলাত মিলিয়ে পড়ো না। কারণ, আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, (মাঝে) কথা না বলে বা বের হয়ে না গেয়ে কোন স্বলাতকে যেন অন্য স্বলাতের সাথে মিলিয়ে না পড়ি।'

(ঘ) এতে যিক্‌র ও দুআ অনুমান করে প্রমাণ হতে পারে; তবে হাত তুলে বা জামাআত করে নয়। পরন্তু উদ্দেশ্য ছিল, ফরয স্বলাতের সাথে মিলিয়ে সুন্নত না পড়া। ইমাম আবূ দাউদ এই হাদীসটি যে পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন, তার শিরোনাম হচ্ছে, 'সেই ব্যক্তি প্রসঙ্গে যে সেই জায়গাতেই সুন্নত পড়ে, যে জায়গাতে ফরয পড়েছে।'

(১৬) 'সালাতে হাকিম'-এর ১৯ পৃষ্ঠায় লেখক তোফাইল বিন উমার-এর নাম

দিয়ে যে হাদীসটির উল্লেখ করেছেন, তাতে উনি 'তুফাইল বিন আম্‌র'এর স্থলে 'তোফাইল বিন উমার করেছেন, যেটা মারাত্মক ভুল। দ্বিতীয়তঃ হাদীসটির অর্থেও তিনি ভুল করেছেন। তিনি লিখেছেন, **'তাতে আছে, আল্লাহর রাসূল (সঃ) হাত তুলে দোয়া করে বললেন - হে আমার পালনকর্তা আল্লা, দোউসের দুটি ছেলে সহ তাদের বাখশাশ বা ক্ষমা করো।'**

প্রিয় পাঠক! আপনি এবার মূল হাদীসটি পাঠ করে দেখুন, কোথায় উল্লেখিত কথাগুলি আছে?

وَحَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ الطُّفَيْلَ ابْنَ عَمْرٍو هَاجَرَ وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَمَرِضَ فَجَزِعَ فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ فَرَآهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فِي مَنَامِهِ فَرَآهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ فَقَالَ لَهُ مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ فَقَالَ غَفَرَ لِي بِهِجْرَتِي إِلَى نَبِيِّهِ ﷺ فَقَالَ مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْكَ قَالَ قِيلَ لِي لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ.

অর্থাৎ, দাওস গোত্রের তুফাইল বিন আম্‌র হিজরত করলে তাঁর গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁর সাথে হিজরত করে। মদীনার আবহাওয়া অনুকূল না হওয়ার ফলে সে ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়ে। সে অধৈর্য হয়ে তীরের ফলা দিয়ে নিজের হাতের আঙ্গুলের জোড় কেটে ফেলে। এর ফলে তার দুটি হাত হতে সজোরে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে এবং পরিশেষে সে মারা যায়। তুফাইল বিন আম্‌র তাকে স্বপ্নে দেখেন, তার আকার-আকৃতি সুন্দর। কিন্তু দেখলেন, সে তার হাত দুটিকে ঢেকে আছে। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার প্রতিপালক তোমার সাথে কি আচরণ করেছেন? সে বলল, নবী ﷺ-এর দিকে হিজরত করার কারণে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, তোমার হাত দুটি ঢাকা কেন? সে বলল, আমাকে বলা হয়েছে, তুমি নিজে যা নষ্ট করেছ, তা কখনই ঠিক করব না। তুফাইল আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট এ ঘটনা খুলে বললে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "হে আল্লাহ! আর তার হাত দুটিকেও ক্ষমা করে দাও।" *(মুসলিম ১৬৭নং)*

লক্ষ্য করুনঃ-

(ক) হাদীসে কোন প্রকার স্বলাতের উল্লেখ নেই।

(খ) উল্লেখিত সহীহ মুসলিমের হাদীসে হাত তোলার কোন কথাই নেই।

(গ) হাদীসে দাওসের ছেলে দু'টিকে ক্ষমা করার কথা নেই।

(ঘ) 'দাওস' একটি গোত্রের নাম। ঘটনায় উল্লেখিত ব্যক্তির দু'টি হাতের আরাবী

হচ্ছে, وَلِيَدَيـهِ সম্মানিত লেখক সেটিকে وَلَدَيـهِ ভেবে তার ভুল অর্থ করে বসেছেন। যদিও এ অর্থে আরবী বাক্যই শুদ্ধ হয় না। তিনি স্কুলে আরাবীর শিক্ষক। সেখানে কি পরিমাণ আরাবী পড়ানো হয়, তা তিনি ভালভাবেই অবগত আছেন। সরকারী চাকুরে মৌলবীরা ভাবেন যে, যোগ্যতা আছে বলেই তাঁরা চাকুরি পেয়েছেন। কিন্তু আমাদের হিসাব এ ক্ষেত্রে অন্যরূপ। অর্থাৎ, যোগ্য আলিম সরকারী চাকুরিতে গেলে তিনি ক্রমশঃ অযোগ্যতার দিকে ধাবমান হন। এই অনুবাদ ছাড়া অন্য স্থানেও বিভিন্ন অনুবাদই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

(১৭) **মা আয়েশার হাদীস, আমি নাবী কারীম (সঃ)-এর দুটি হাত তোলা অবস্থায় তাঁকে দেখতে পেলাম, তিনি হযরত উসমানের (রা) জন্য দোয়া করছেন।** *(সালাতে হাকিম ২০পৃঃ)*

(ক) এতে স্বলাতের পরের কথা নেই।

(খ) এতে সম্মিলিতভাবে দুআ করার কথাও নেই।

(১৮) **মুসলীম শরীফে, আব্দুর রহমান ইবনে সামোরার হাদিসে কোসুফ নামাযের বিবরণে, আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি নাবী করিমের নিকটস্থ হলাম, তিনি তখন দুটি হাত তুলে দোয়া করছেন।** *(ঐ ২০পৃঃ)*

এবার আসুন! আমরা সরাসরি হাদীসটি সহীহ মুসলিম হতে পড়ে নিই ঃ-

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كُنْتُ أَرْتَمِي بِأَسْهُمٍ لِي بِالْمَدِينَةِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ كَسَفَتْ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهَا فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى مَا حَدَثَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ <u>وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ</u> رَافِعٌ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يُسَبِّحُ وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ وَيَدْعُو حَتَّى حُسِرَ عَنْهَا قَالَ فَلَمَّا حُسِرَ عَنْهَا قَرَأَ سُورَتَيْنِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

ভাবার্থ হল, সাহাবী আব্দুর রহমান বিন সামুরাহ ﷺ আল্লাহর রসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় মদীনাতে তীর চালাতেন। ইত্যবসরে সূর্যগ্রহণ হলে তিনি তীরগুলিকে রেখে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট চলে আসেন এই জন্য যে, তিনি এই মুহূর্তে কি করছেন, তা দেখবেন। তিনি দেখলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ <u>স্বলাত অবস্থায় দাঁড়িয়ে হাত দুটিকে উত্তোলনপূর্বক 'সুবহানাল্লাহ', 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার' বলছেন</u> ও দুআ করছেন, অতক্ষণ করলেন, যতক্ষণ না সূর্য গ্রহণ দূর হয়ে গেল। অতঃপর তিনি দুটি সূরা পড়ার মাধ্যমে দু' রাকআত স্বলাত আদায় করলেন।

লক্ষ্য করুন যে, সামুরাহ ও আয়েশার হাদীস এক নয়। আয়েশার হাদীসে খুতবার

উল্লেখ আছে ঃ-

ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَزَادَ أَيْضًا ثُمَّ <u>رَفَعَ يَدَيْهِ</u> فَقَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ.

অর্থাৎ তিনি খুতবা দিলেন এবং তাতে বললেন, নিশ্চয় সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর দুটি নিদর্শন। বর্ণনায় অতিরিক্তভাবে আয়েশা (রাঃ) বলেন, অতঃপর তিনি তাঁর হাত দুটি তুলে বললেন, "হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিলাম?"

(ক) আব্দুল হাকীম সাহেব দুটি হাদীসের বিপরীতমুখী অর্থসমূহকে এক করে দিয়েছেন; এতে তিনি সত্যকে ধামা-চাপা দিয়েছেন অথবা তাঁর ইলমে হাদীসের ইল্মী আমানতের অভাব রয়েছে।

(খ) সামুরাহর হাদীসে স্বলাতের ভিতরে দুআর উল্লেখ রয়েছে, স্বলাতের পরে নয়। আয়েশার হাদীসে খুতবার পরে হাত তোলার উল্লেখ রয়েছে, দুআর উল্লেখ নেই। বরং হাত তুলে তাবলীগের উপর সাক্ষ্য রাখার কথা বলা হয়েছে।

(গ) সামুরাহর হাদীসটি যে স্বলাতের কথা বলা হয়েছে, তা ফরয নয়। তাছাড়া স্বলাতের ভিতরে হাত তুলে কুনূতের দুআতে কোন সমস্যা নেই।

সুতরাং এ ধরনের হাদীস দ্বারা ফরয স্বলাতের পরে ইমাম-মুক্তাদী মিলে জামাআতী দুআর জন্য দলীল সংগ্রহ করা কতটা যুক্তিযুক্ত, তা বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলীর উপর ছেড়ে দিলাম।

(১৯) **মা আয়েশার আরেকটি হাদিসে বাকী' অধিবাসীদের জন্য তাঁর দোয়ায় হাত তুললেন। তাঁর দুটি হাত তুললেন তিন বার।** (মুসলিম) তোহফাতুল আহবুযী ২৪৬পৃঃ *(সালাতে হাকিম ২০পৃঃ)*

এ হাদীসে কবর যিয়ারত করতে গিয়ে হাত তুলে দুআর কথা বলা হয়েছে। কবর যিয়ারতে কবর বাসীর জন্য একাকী হাত তুলে দুআ করা সুন্নত। এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ দিয়ে <u>ফরয স্বলাতের</u> পর <u>হাত তুলে</u> ইমাম-মুক্তাদী <u>মিলে</u> জামাআতী <u>দুআ</u> প্রমাণ করা যায় না।

(২০) মক্কাবিজয়ে - আবূ হুরাইরার সুবৃহৎ হাদীসে - তিনি তাঁর দুটি হাত তুলে দোয়া করতে লাগলেন। *(ঐ ২০পৃঃ)*

হাদীসটি সহীহ মুসলিম হতে গৃহীত , যার শব্দাবলী নিম্নরূপ ঃ-

فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الصَّفَا فَعَلَا عَلَيْهِ حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَ.

অতঃপর তিনি যখন তাওয়াফ থেকে ফারেগ হলেন, তখন স্বাফা পাহাড়ে চড়ে কা'বার দিকে তাকিয়ে নিজের হাত দুটিকে তুললেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করতে ও ইচ্ছামত দুআ করতে লাগলেন।

এ হাদীস দ্বারাও ফরয স্বলাতের পর জামাআতী দুআ প্রমাণ হয় না। পক্ষান্তরে যা প্রমাণ হয় তা সাঙ্গ করতে গিয়ে স্বাফা পাহাড়ে চড়ে একাকী হাত তুলে দুআ। আর তাতে কারো দ্বিমত নেই।

(২১) বুখারী মুসলীমে, ইবনুত তুবাইয়্যার (?!) বিবরনে আবূ হোমায়েদের হাদিসে, তিনি (সঃ) এমনভাবে হাত তুললেন, বর্ণনাকারী বলছেন, আমি তাঁর (সঃ) বগলের ধূসররং (অন্য হাদিসে সফেদী) দেখতে পেলাম। তিনি (সঃ) বলছিলেন, হে আল্লা (তাবলিগ করতে পারলাম? আমি কি প্রচার করতে পেরেছি?) আমি কি পৌঁছাতে পারলাম? *(ঐ ২০-২১পৃঃ)*

(ক) আব্দুল হাকিম সাহেব! (হাফিযাকুমুল্লাহু আনিল ফিতান।) আপনার সাথে আমার সাক্ষাৎ নেই। কিন্তু আপনার বই পড়ে মনে হচ্ছে যে, আপনি হাদীস নিয়ে গভীর অধ্যয়ন করেননি। নইলে যে কোন কারণেই হাত উঠানো হোক না কেন, আপনি তাতে ফরয স্বলাতের পর জামাআতী দুআর জন্য হাত উঠানো হয়েছে বলে বুঝে যাচ্ছেন ও অন্যকে বুঝানোর জন্য বই লিখে ফেলেছেন। অবাক লাগছে এই জন্য যে, আপনার জ্ঞানের এই বহরকে শর্তহীনভাবে সমর্থন করে বয়ান দিয়েছেন তথাকথিত শাইখুল হাদীসদের কয়েকজন! তাঁরা একটি টিপ্পনীও দেননি!

যাই হোক, হাদীসটি একবার পড়ে নিন ও দেখুন, আপনার দাবীর সমর্থনে কিছু আছে কি না?

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِىُّ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِىُّ – ﷺ – رَجُلاً مِنْ بَنِى أَسَدٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتبِيَّة عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِىَ لِى . فَقَامَ النَّبِىُّ – ﷺ – عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: « مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ ، فَيَأْتِى يَقُولُ هَذَا لَكَ وَهَذَا لِى . فَهَلاَّ جَلَسَ فِى بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ يَأْتِى بِشَىْءٍ إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ» ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَىْ إِبْطَيْهِ « أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ » ثَلاَثًا.

আবূ হুমাইদ সায়েদী ﵁ বলেন, নবী ﷺ বনী আসাদের ইবনে লুত্‌বিয়্যাহ নামক এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায় করার কাজে কর্মচারী নিয়োগ করলেন। সে ব্যক্তি (আদায়কৃত মাল সহ) ফিরে এসে বলল, 'এটা আপনাদের (বায়তুল মালের), আর

এটা আমাকে উপহার স্বরূপ দেওয়া হয়েছে।' এ কথা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ উঠে দন্ডায়মান হয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করে বললেন, "অতঃপর বলি যে, আল্লাহ আমাকে যে সকল কর্মের অধিকারী করেছেন তার মধ্য হতে কোনও কর্মের তোমাদের কাউকে কর্মচারী নিয়োগ করলে সে ফিরে এসে বলে কি না, 'এটা আপনাদের, আর এটা উপহার স্বরূপ আমাকে দেওয়া হয়েছে!' যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে তার বাপ-মায়ের ঘরে বসে থেকে দেখে না কেন, তাকে কোন উপহার দেওয়া হচ্ছে কিনা? আল্লাহর কসম; তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন জিনিস অনধিকার গ্রহণ করবে সে কিয়ামতের দিন তা নিজ ঘাড়ে বহন করা অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে। অতএব আমি যেন অবশ্যই চিনতে না পারি যে, তোমাদের মধ্য হতে কেউ নিজ ঘাড়ে চিঁহি-রববিশিষ্ট উট, অথবা হাম্বা-রববিশিষ্ট গাই, অথবা মেঁ-মেঁ-রববিশিষ্ট ছাগল বহন করা অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করেছ।"

অতঃপর নবী ﷺ তাঁর উভয় হাতকে উপর দিকে এতটা তুললেন যে, তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দেখা গেল। অতঃপর (তিনবার) বললেন, "হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিলাম?" *(বুখারী ৬৯৭৯, ৭১৭৪, মুসলিম ১৮৩২নং, আবূ দাউদ)*

(ক) আপনি এ হাদীসে ইবনুল লুতবিয়্যাহ শব্দকে ভুল করে একটি লাম ছেড়ে পড়ে 'ইবনুত তুবাইয়্যা' মনে করেছেন। এখানেও আপনার আরাবী জ্ঞানের গভীরতা আন্দাজ করা যেতে পারে।

(খ) আল্লাহর রসূল ﷺ ইবনুল লুতবিয়্যাহর ভুল সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে খুতবাহ দিয়েছিলেন। অতঃপর দুই হাত তুলে আল্লাহকে তবলীগের উপর সাক্ষী রেখে তার সম্পর্কে শরীয়তের সঠিক সিদ্ধান্ত প্রচার করেছিলেন। সে জন্য তিনি তিনবার প্রশ্ন রেখেছিলেন আল্লাহর নিকটে এই বলে যে, তিনি কি তবলীগের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়েছেন?

(গ) এতে না আছে স্বলাতের পরে দুআর কথা, আর না আছে জামাআতী দুআর কোন বিষয়।

(২২) আব্দুল্লা ইবনে উমার হতে বর্ণিত, নাবী (সঃ) হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং হযরত ঈসা (আঃ)এর বিবরণ দিতে গিয়ে তাঁর দুটি হাত তুলে বললেন, 'হে ইলাহী! আমার উম্মাত?' *(প্রাগুক্ত ২১পৃঃ)*

(ক) আব্দুল্লাহ বিন উমার নয়; আব্দুল্লাহ বিন আম্র হতে বর্ণিত।

(খ) ইব্রাহীম ও ঈসা (আঃ) সম্পর্কিত দুটি আয়াত তেলাঅত করে নবী ﷺ নিজ হাত দুটিকে তুলে বললেন, "হে আল্লাহ! আমার উম্মত?"

এখানেও স্বলাত বাদে দুআ নয়। আর জামাআতী দুআও নয়।

(২৩) হযরত উমার ফারুক ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূলের উপর ওয়াহী (প্রত্যাদেশ) অবতীর্ণ হতো, তখন তাঁর সম্মুখভাগে মৌমাছির গুনগুনানী শব্দের ---- --------- কেবলামুখ হলেন এবং দু'টি হাত তুলে দোয়া করলেন। *(ঐ ২১পৃঃ)*

(ক) প্রথমতঃ হাদীসটি সহীহ নয়। *(দেখুন সিলসিলাহ যয়ীফাহ ১২৪২নং)*

(খ) দ্বিতীয়তঃ এটি স্বলাতের পরেও নয় এবং জামাআতী দুআও নয়।

(২৪) উসামা বলেন, আরাফায় নাবী কারিমের (সঃ) পশ্চাতে থাকা কালিন তাঁর দু'হাত তুলে দোয়া করতে থাকলেন -----। *(ঐ ২১পৃঃ)*

এ দুআর ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। আরাফাতের ময়দানে হাজীগণ হাত তুলে একাকী দুআ করে থাকেন। আর তা স্বলাতের পরও নয় এবং জামাআতী দুআও নয়। আরাফায় মহানবী ﷺ সাহাবাদেরকে নিয়ে যোহর-আসর জমা করে পড়েছেন। পেয়েছেন কোথাও লক্ষ সাহাবার মধ্যে একজনের বর্ণনা যে, তিনি ঐ বিশাল জামাআতের সুযোগ গ্রহণ করে ঐ স্বলাতের পর হাত তুলে জামাআতী দুআ করেছেন?

(২৫) আবূ দাউদ (রহঃ) সুন্দর সানাদে বর্ণনা করেছেন, ---- পুনরায় রসূল (সঃ) তাঁর দুটি হাত তুলে তিনি বললেন, 'হে আল্লা তোমার শুভকামনা, তোমার অনুগ্রহ, তোমার করুণা সাদ ইবনে উবাদার বংশে বর্ষিত করো।'

প্রথমতঃ এ হাদীস সহীহ নয়। *(দেখুন ঃ যয়ীফ আবূ দাউদ, আলবানী)* দ্বিতীয়তঃ তা স্বলাতের পরে নয় এবং জামাআতী দুআও নয়। বরং সা'দ ﷺ-এর ভক্তি ও খিদমত প্রদর্শনের বিনিময় স্বরূপ দুআ।

(২৬) 'সালাতে হাকিম'-এর ২৯পৃষ্ঠায় এবং 'প্রশ্নোত্তরে ফরয নামাযের পর দোওয়া' ৪৭ পৃষ্ঠায় লিখা হয়েছে, যার ভাবার্থ হল, **'দোয়া তো ইবাদাত, একা করতে পারে, সবাই মিলে করতে পারে। ইজতেমায়ী দোয়া বেশী কবুল হয়।'**

দলীল স্বরূপ মিশকাতের কিতাবুল ইলমের দ্বিতীয় অধ্যায় হতে একটি হাদীসের অংশবিশেষ উভয়েই নকল করেছেন। হাদীসটি হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ-

ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه الشافعي والبيهقي في المدخل

অর্থাৎ, তিনটি বিষয় এমন আছে, যাতে কোন মুসলিমের হৃদয় খিয়ানত করতে পারে না। (এক) নির্ভেজালভাবে আল্লাহর জন্য আমল করা। (দুই) সাধারণ মুসলিমদের জন্য কল্যাণ কামনা করা। (তিন) মুসলিমদের জামাআতকে আঁকড়ে ধরে থাকা। কেননা, তাঁদের (ঐক্যবদ্ধতার) আহবান তাঁদের সকলকে পরিবেষ্টন করে

রাখে। *(মিশকাত, তাহক্বীক্ব সহ হাদীস নং২২৮)*

আব্দুল হাকীম সাহেব অনুবাদ করেছেন, 'মুসলমানদের জামাআতকে অবশ্যই আঁকড়ে ধরো, কারণ তাদের **সম্মিলিত** দোয়া তাঁদের পশ্চাৎ দিক থেকে (বালা মসিবত) আটকে রাখে।'

জানি না, তিনি হাদীসের শব্দাবলীর মধ্যে কোন্ শব্দটির তর্জমা **'সম্মিলিত'** করেছেন। মনে হয়, তিনি স্বীয় মতলব হাসিলের জন্য নিজ পকেট হতে বৃদ্ধি করেছেন।

আর মাঝহারুল ইসলাম সাহেব অর্থ করেছেন, **'কারণ জামায়াতের দোওয়া সকলকে ঘিরে থাকে।'** তাঁর এই মানেটাও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কারণ হাদীসটিতে এমন কোন শব্দ নেই।

এ হাদীসটি বিভিন্ন বর্ণনায় বিভিন্নভাবে এসেছে, সেগুলিকে লক্ষ্য করুন ঃ-

(١) ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم : إخلاص العمل لله ، ومناصحة ولاة المسلمين ، ولزوم جماعتهم ، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. المعجم الأوسط للطبراني (ج١٢/ص ٢٨)

(٢) ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن : إخلاص العمل لله ، والطاعة لذوي الأمر ، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. مستدرك الحاكم (١/٢٨٤)

(٣) فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ ، تُحِيطُ مَنْ وَرَاءَهُمْ. المعجم الكبير للطبراني – (ج ٢ / ص ١٦٤)

(٤) فإن دعوتهم تكون من ورائهم. مستدرك الحاكم – (ج ١ / ص ٢٨٥)

(٥) والنصيحة لولى الأمر ولزوم الجماعة، فان دعوتهم تكون من ورائه. مسند الإمام أحمد بن حنبل بأحكام شعيب الأرناؤوط – (ج ١٦ / ص ٢٠٨) أي من وراء ولي الأمر.

(ক) লক্ষ্য করুন যে, হাদীসে উল্লেখিত 'মুসলমানদের জামাআত' মানে কোন সংগঠন নয়, কোন মসজিদের জামাআত নয়। বরং ঐ জামাআত থেকে উদ্দেশ্য এক রাষ্ট্রনেতার অধীনে দেশের সমগ্র জামাআত বা জাতি। সেই জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে নিষেধ করা হয়েছে।

(খ) হাদীসে উল্লেখিত 'দাওয়াত' মানে 'দোয়া' বা 'দোওয়া'নয় এবং জামাআতী দোয়াও নয়; যেমন বুঝানো হয়েছে। বরং তার মানে বাদশা বা শাসকের আহবান। প্রণিধান করুন মুহাদ্দিসীনদের ব্যাখ্যা ঃ-

وأما قوله : (فإن دعوتهم تحيط من ورائهم أو هي من ورائهم محيطة) فمعناه عند أهل العلم أن أهل الجماعة في مصر من أمصار المسلمين إذا مات إمامهم ولم يكن لهم إمام فأقام أهل ذلك المصر الذي هو حضرة الإمام وموضعه إماما لأنفسهم اجتمعوا عليه ورضوه فإن كل من خلفهم وأمامهم من المسلمين في الآفاق يلزمهم الدخول في طاعة ذلك الإمام إذا لم يكن معلنا بالفسق والفساد معروفا بذلك، لأنها دعوة محيطة بهم يجب إجابتها ولا يسع أحدا التخلف عنها لما في إقامة إمامين من اختلاف الكلمة وفساد ذات البين. التمهيد لابن عبد البر — (ج ٢٢ / ص ١٠٨–١٠٩)

ইবনে আব্দুল বার্র বলেন, উলামাগণের নিকট **'ফাইন্না দাওয়াতাহুম তোহিতো মিন অরায়েহিম'**-এর অর্থ এই যে, মুসলিমদের কোন রাষ্ট্রের জামাআতের ইমাম (রাষ্ট্রনেতা) মারা গেলে এবং তাদের ইমাম না থাকলে যখন ঐ ইমামহীন রাষ্ট্রের লোকেরা তাদের জন্য একজন ইমাম নির্বাচন করবে; তাঁর ব্যাপারে একমত হবে, তাঁকে নিয়ে সন্তুষ্ট হবে, তখন তাদের পশ্চাতে ও সামনে দূর-দূরান্তে যে সকল মুসলমান থাকবে, তাদের জন্য ঐ ইমামের আনুগত্যে প্রবেশ করা জরুরী হবে; যদি তিনি প্রকাশ্যরূপে পাপাচার ও ফাসাদে লিপ্ত না থাকেন এবং তাতে পরিচিত না হন। কারণ (তাঁদের) আহবান তাদেরকে (ঐ দূরবর্তী মুসলমানদেরকে) পরিবেষ্টন করে থাকে। সে আহবানে সাড়া দেওয়া ওয়াজেব। সে আহবানে সাড়া না দিয়ে পিছিয়ে থাকার কারো অবকাশ নেই। যেহেতু (তারা ঐ ইমাম না মেনে অন্য ইমাম মানলে) দুজন ইমাম নির্বাচনে অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হবে। *(তামহীদ ২২/১০৮-১০৯)*

বুঝতেই পারছেন যে, কোথায় নানীর কবর, আর কোথায় আমরা কাঁদছি?

(২৭) 'রাসূল (সঃ) বলেছেন ঃ তিনটি কাজ, তা কারো পক্ষে করা হালাল বা বৈধ নয়। প্রথম কাজ, যে ব্যক্তি কোন গোত্রের ইমামতী করে, সে মুকতাদীদেরকে না নিয়ে দোয়া করে থাকে, তাহলে সে তাদের পক্ষ থেকে আমানতের খিয়ানত করল---। মিশকাত'

'কোন ইমামের উচিৎ নয় যে, মুক্তাদিগণকে বাদ দিয়ে কেবল নিজের জন্য দোওয়া করবে তাহা হলে সেই ইমাম মুক্তাদির সঙ্গে খিয়ানত করল।

(প্রশ্নোত্তরে ফরয নামাযের পর দোওয়া ২৬পৃঃ, সালাতে হাকিম ৩১পৃঃ)

শেযোক্ত বইয়ের ৩২ পৃষ্ঠায় লেখক আরো লিখেছেন, **'এখানে ইমামের কর্তব্যে যৌথ দোয়া করার যথেষ্ট ইঙ্গিত বহন করছে। এটাই তো প্রচলিত সুন্নাত অনাদি কাল থেকে?!'**

(ক) এ হাদীস থেকে স্বলাতের পর হাত তুলে যৌথ দুআ প্রমাণ হয় না।

(খ) ইমামের সাথে মুক্তাদীর সম্পর্ক সালাম ফিরা পর্যন্ত। সালাম ফিরা হয়ে গেলে নামাযও শেষ, ইক্তিদাও শেষ। অতএব দুআর খেয়ানত হলে হতে হবে নামাযের ভিতরে; নামাযের বাইরে নয়। যেমনটি মাঝহারুল ইসলাম সাহেব তাঁর বইয়ের ১৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে, সালাম ফিরা হলে তার জন্য (মুক্তাদীর) সব হালাল হয়ে যায়। তবে তিনি কোন বিষয়ের 'সম্ভাবনা' যে একটি দলীল সেটা দিয়ে সালাম ফিরার পরেও 'স্বলাতের ইমাম' মুক্তাদীদের জন্য ইমাম থেকে যান - এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। অতএব যৌথ দুআ না হলে খেয়ানত প্রমাণিত হবে না। যেহেতু তিনি তখনও ইমাম থাকছেন তখন যৌথ দুআ করতে হবে।

দলীল হিসেবে তিনি (আউনুল মা'বূদ ১ম খণ্ড ৩৭পৃঃ) হতে আরাবী ইবারত নকল করেছেন,

والدعاء بعد التسليم يحتمل كونه كالداخل.

অর্থ করেছেন, 'সালাম ফিরিবার পর ইমাম নিজের জন্য দোওয়া খাস করলে খিয়ানত হবে, যেমন নামাযের মধ্যে দোওয়াকে খাস করলে খিয়ানত করা হয়।'

এটা একমাত্র দলীলের যারা পূর্ণ খিয়ানত করতে অভ্যস্ত তাঁরাই এমন সম্ভাবনা ব্যক্ত করতে পারেন। যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ 'তাহলীলুহাত তাসলীম' দ্বারা স্বলাত সম্পর্কিত বিষয়াদি হতে মুক্ত ঘোষণা করেছেন, সেখানে এ হুযুরগণ দলীলের উপরে 'ইহতিমাল' ও সম্ভাবনাকে প্রাধান্য দান করে (মুনাজাত-বিরোধী) ইমামকে খিয়ানতকারীরূপে চিহ্নিত করেছেন। আল্লাহ এদের ক্ষমা করুন।

(গ) আদিহীন কাল (?) থেকে প্রচলিত সুন্নাতের খেলাপ করেছেন স্বয়ং আমাদের আদর্শ মহানবী ﷺ। সুতরাং জামাআতী নামাযের ইমামতি করতে গিয়ে বুকে হাত বেঁধে দুআয়ে ইস্তিফতাহতে বলেছেন, 'আল্লাহুম্মা বায়েদ বাইনী---।' অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি আমার---। দুই সাজদার মাঝে বলেছেন, 'রাব্বিগফির লী--।' (আমাকে ক্ষমা কর।) কেবল নিজের জন্য একবচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। অনুরূপ আরো অন্যান্য দুআতেও তিনি একবচন শব্দ ব্যবহার করেছেন। অথচ নিশ্চয় তা খেয়ানত নয়।

(ঘ) আর তার মানেই হল, খেয়ানতের ঐ হাদীস আমলযোগ্য নয়।

এ হাদীসের ব্যাপারে মুহাদ্দিস আলবানী হাদীসটি অশুদ্ধ প্রমাণ করে কি বলছেন শুনুনঃ-

وقد حكم ابن خزيمة على الشطر الثاني من الحديث بالوضع وأقره ابن تيمية وابن القيم، وذلك لأن عامة أحاديث النبي ﷺ في الصلاة – وهو الإمام – بصيغة الإفراد وقد سبق بعضها في الكتاب (٣٢١/١) فكيف يصح أن يكون ذلك خيانة لمن أمهم ؟

হাদীসের দ্বিতীয় অংশটিকে ইবনু খুযাইমা 'জাল' বলে অভিহিত করেছেন এবং এ ফায়সালায় ইবনু তাইমিয়্যাহ ও ইবনুল কাইয়েম (রঃ) ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন। যেহেতু নবী ﷺ-এর ইমাম অবস্থার অধিকাংশ (দুআর) হাদীস একবচন শব্দে বর্ণিত হয়েছে। যার কিছু হাদীস (ও দুআ) এই কিতাবের (১/৩২১)এ পার হয়ে গেছে। অতএব এ কথা কিভাবে শুদ্ধ হতে পারে যে, তিনি যাদের ইমামতি করেছেন, তাদের খিয়ানত করেছেন? *(তামামুল মিন্নাহ ১/২৭৮)*

(২৮) রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, দুআ অপেক্ষা সম্মানিত কোন বিষয় নেই। *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সালাতে হাকিম ৩৮পৃঃ)*

(২৯) "যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে না, আল্লাহ তার উপর রাগান্বিত হন।" *(তিরমিযী ৫/৪৫৬, ইবনে মাযাহ ২/১২৫, সালাতে হাকিম ৪০পৃঃ, প্রশ্নোত্তরে ৪৯পৃঃ)*

এগুলি সাধারণ দুআর ফযীলত সম্বলিত হাদীস। এগুলিতে হাত তুলে বা জামাআত করে বা স্বলাতের পরে কোন কথাই নেই।

(৩০) নবী (সাঃ) বলেছেন, 'তোমরা যখন আল্লাহর নিকট কিছু চাইবে, তখন তোমাদের হাতের দিক সামনে রাখবে ----। যখন দুআ শেষ করবে, তখন তোমাদের হাত মুখে ফিরাবে।' আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ২০৯পৃঃ, সালাতে হাকিম ৪৬পৃঃ)

(ক) দুআ শেষে মুখে হাত বুলানোর কোন হাদীস সহীহ নয়। *(দেখুন ঃ যয়ীফুল জামে ৩২৭৪, ৪৪১২নং)*

(খ) এতে ফরয স্বলাতের পর বা জামাআতের কথা নেই। সুতরাং সম্মিলিতভাবে দুআপন্থীদের এ দলীল কোন কাজে আসার যোগ্য নয়।

(৩১) নবী (সঃ) বলেন, সব থেকে বড় অকর্মা ও অক্ষম সেই ব্যক্তি, যে নিজের জন্য আল্লাহর নিকট দুআ প্রার্থনা করে না।---' তাবরানী। *(সালাতে হাকিম ৪৭পৃঃ)*

এ হাদীস পেশ করার অর্থ কি এই যে, যারা ফরয স্বলাতের পর তথাকথিত মুনাজাত করে না, তারা আসলে দুআই করে না? যদি এ রকম কেউ বুঝে থাকেন, তাহলে 'রাম উল্টা বুঝিলে' বলার কি আছে? আল্লাহর কসম! এই জামাআতী দুআ, সমস্বরে জামাআতী দরূদ এবং সমস্বরে জামাআতী ঈদের তকবীর -এগুলির প্রকৃতত্ব জানার পূর্বে এত ভালো লেগেছে যে, তা পরম আবেগ ও চরম উদ্দীপনার সাথে করেছি, তখন আমাদের চেয়ে এগুলির বেশী ভক্ত অন্য কেউ ছিল বলে মনে করতে পারতাম না।

আজও তা ভালো লাগে। কিন্তু তা শরীয়ত-সম্মত নয় জানার পর থেকে মহব্বত থাকতেও বর্জন করেছি। যেহেতু শরীয়তের আমল কেবল ভালো মনে করে মহব্বত ও আবেগবশে পালন করলেই হয় না, আসলে তা তরীকায়ে মুহাম্মাদী কি না -তা দেখতে হয়। যেহেতু তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে, যাতে আমাদের কোন নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।" *(মুসলিম)*

(৩২) **'বোখারী ও মুসলীম শরীফে একটি বড় হাদীসে বর্ণিত আছে, --- মানুষ যখন একত্রিত হয়ে যিকির করে এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভের দুআ করে। তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশ্তাদেরকে বলেন যে, তোমরা স্বাক্ষী থেকো। আমি তাঁদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিলাম। (মিশকাত)'**

এ হাদীস দ্বারা জামাআতী যিক্র বা ফরয নামাযের পর হাত তুলে দুআ প্রমাণিত হয় না। হাদীসে সেই মজলিস উদ্দিষ্ট, যাতে আল্লাহর যিক্র থাকে। যেমন, তসবীহ-তাহলীল-তকবীর, দুআ, কুরআন তেলাঅত, হাদীস পাঠ, ইসলামী জালসা ইত্যাদি।

(৩৩) **'সহীহ হাদীসের আম দলীল দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, নাবী (সাঃ) জামাআত সহকারে দুই হাত তুলে দুআ করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ঐ দুআর প্রতি আ-মীন - আ-মীন ।। বলেছেন।'** *(সালাতে হাকিম ৩৪পৃঃ)*

জী হ্যাঁ। নিঃসন্দেহে এটি সত্য কথা। আপনিও তাঁর সুন্নাহর অনুসরণে সেই দুআ করুন যা সহীহ হাদীসে প্রমাণ আছে। খুতবার ইস্তিস্কায় ও কুনূতে নাযেলায় হাত তুলে জামাআতবদ্ধভাবে সেই দুআ করুন। তা বলে এই দেখে আরো অন্য জায়গায় 'নকল আবিষ্কার' করবেন, তার অনুমতি শরীয়তে নেই।

(৩৪) মাঝহারুল ইসলাম সাহেব তাঁর বই 'প্রশ্নোত্তরে ফরয নামাযের পর দোওয়া'র ২৭ পৃষ্ঠাতে সূরা আলে ইমরানের ৬১ আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে তাফসীর জালালাইনের বরাতে লিখেছেন,

وقد خرج ومعه الحسن والحسين وفاطمة وعليّ وقال لهم : « إذا دعوت فأمِّنوا » ، فـأبَوْا أن يلاعنوا وصالحوه على الجزية .

অর্থাৎ, নাজরানের খৃষ্টানরা যখন সত্য কথা মেনে নেওয়ার পরিবর্তে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে শত্রুতার পথ অবলম্বন করল, তখন তিনি তাদের সাথে আল্লাহর নির্দেশে এক অপরের প্রতি অভিশাপ প্রার্থনাতে অংশগ্রহণের আহবান জানালেন। যাকে শরীয়তের ভাষাতে 'মুবাহালাহ' বলা হয়। যে মিথ্যুক হবে, তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হবে। বলা বাহুল্য, এতে অংশ নেওয়ার জন্য রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হাসান, হুসাইন, ফাতিমা ও আলী ؓ ছিলেন। তিনি তাদের বলেছিলেন, **'আমি যখন**

দুআ করব, তখন তোমরা আমীন বলবে।'

খৃষ্টানরা 'মুবাহালাহ' করতে অস্বীকার করে ও ট্যাক্স দিয়ে বসবাস করার ভিত্তিতে সন্ধি করে নেয়।

(ক) উক্ত বর্ণনাটির ব্যাপারে ইবনে হাজার 'আল-কাফী আশ্‌শাফী'তে বলেছেন,

أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة من طريق محمد بن مروان السدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس بطوله وابن مروان متروك متهم بالكذب.

অর্থাৎ, এই ঘটনাটি আবূ নুআইম 'দালায়েলুন নুবুওয়াহ'তে মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান সুদ্দী সূত্রে, তিনি কালবী হতে, তিনি আবূ স্বালেহ হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা দীর্ঘাকারে করেছেন। আর ইবনে মারওয়ান 'মাতরূক' (পরিত্যক্ত) মিথ্যাবাদিতায় অভিযুক্ত।

(খ) তবুও এখানে ফরয স্বলাত শেষে যে 'জামাআতী মুনাজাত' নিয়ে বিতর্ক চলছে তার সমর্থনে কোন 'মাল-মসলা' নেই।

(গ) এখানে স্বলাতের কোন উল্লেখ নেই। সুতরাং পুরনো অভ্যাস প্রমাণ করতে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য এ সব দিয়ে কোনও কাজ হবে না।

মাওলানাদ্বয়ের কিছু যুক্তি ও বিগত উলামা সাহেবানদের কিছু ফাতাওয়া

(১) মাওলানা আব্দুল হাকিম তাঁর বইয়ের ২৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

'দোয়া সুন্নতই, তা মামুর বেহি। তা আল্লা প্রদত্ত আমর বা আদেশ। যরুরী নাহলে হাদিসে বলা হয়েছে - নামাযে নেকী কম হয়। খেদাজ হয়, নাকেস হয়---।'

জী হ্যাঁ মাওলানা সাহেব! আম দুআ অবশ্যই তাই। স্বলাতের ভিতরের দুআও তাই। কিন্তু স্বলাতের পরে হাত তুলে জামাআতী দুআ ঐরূপ নয়; যেমনটা আপনারা ধারণা পোষণ করে চলেছেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন, "বান্দা যখন আমার কাছে দুআ চায়, তখন তার দুআ কবুল করে নিই।"

আব্দুল হাকিম সাহেব বলেন, **'এই আয়াতে, এই বাক্যে অপরিমিত সময় স্রোত, ক্ষুদ্রসীমায় বেষ্টিত করা হয় নাই। তা পরিলক্ষিত হয়। তাই ফরয নামায বাদে, ঐরূপ দোয়া না করার অলঙ্ঘনীয় দুর্ভেদ্য প্রাচির খাড়া হয়ে যায় না। ঐ বাক্যে, শব্দের প্রথমে এবং শব্দের শেষে, কোথাও কী না বাচক অব্যয় শব্দ আছে? কোরানের অন্য কোথাও**

কি মা, লা, লাইসা, লাম লান আছে কি? এই না বাচক শব্দ দিয়ে ঐ রূপ দোয়া নিষিধ্য হাদিস আছে কি? আন্নাহয়ো বা নিষেধ করা, আলমানয়ো বা মানা করা শব্দ কোথাও কি দেখা যায়?' *(সালাতে হাকিম ২৯পৃঃ)*

আরো লিখা হয়েছে, **'বর্তমানে যাঁরা ফরয নামাযের পর ঈমাম ও মোক্তাদীগণের মিলিত দুআকে বিদাত ও নাজায়েয বলেছেন, তাঁরা সত্যিকারই বিপথগামী এবং মুসলীম সমাজকে বিভ্রান্তকারী। কারণ এইরূপ বিদাত না জায়েয বলার কোনই প্রমাণ কোরান মাজীদের ১১৪টি সূরার মধ্য হতে একটি আয়াত বা নাবীর সহীহ হাদিস পেশ করতে পারবেন কী?'** *(ঐ ৩৫পৃঃ)*

'দোওয়ার জন্য কোন সময়ই নির্দিষ্ট হয়নি। নিষিদ্ধ সময় ছাড়া যে কোন সময় দোয়া করা জায়েয। তার মধ্যে ফরয নামাযের সময়ও শামিল আছে।' *(প্রশ্নোত্তরে ফরয নামাযের পর দোওয়া ১৫পৃঃ)*

উল্লিখিত উক্তিসমূহ ভ্রমাত্মক ও বিভ্রান্তিকর। কোন প্রকৃত আলিম এমন অবান্তর, অযৌক্তিক এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করতে পারেন না। কারণ, তাঁরা জানেন যে, কোন একটি স্বতন্ত্র ইবাদত প্রমাণ করতে স্বতন্ত্র দলীল প্রয়োজন। তাঁরা দাবী করবেন দুআটাই ইবাদত, আর তার পরিমাণ, স্থান, পদ্ধতি ইত্যাদি বেদলীল হবে - এমনটা ভাবা যায় না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا}

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রসূলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। *(আহযাব ২১ আয়াত)*

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} (٥٩) سورة النساء

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও, তাহলে তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রসূল ও তোমাদের নেতৃবর্গ (ও উলামা)দের অনুগত হও। আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। এটিই হল উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর। *(সূরা নিসা ৫৯ আয়াত)*

মহান আল্লাহ তাঁর রসূলকে সর্ববিষয়ে আদর্শ মানব (মডেল ম্যান) হিসেবে তুলে ধরেছেন। আর তাঁরা দুআ করার যে আদর্শ তুলে ধরছেন; তার সাথে রসূল ﷺ-এর

আদর্শের কোন মিল নেই। তাঁরা গলা ফাটাচ্ছেন, ফরয স্বলাত শেষে দুআ বেশী করে কবুল হয়। আর রসূল ﷺ-এর সারা জীবনের ইমামতিতে একটি বারের জন্যও তার কোন সহীহ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। এই দুআ কবূলের রহস্যময় সময় না রসূল ﷺ বুঝলেন, আর না তাঁর সাহাবীবৃন্দ আবূ বাক্‌র, উমার, উসমান ও আলী ﷺ বুঝলেন। এমন একটা উদ্ভট দাবী যে, 'দুআ করার জন্য কোন সময় নির্ধারিত নাই।' 'হাত তুলে দুআ করা উত্তম।' 'নিষেধের কথা কোথাও নেই।' ইত্যাদি জুড়ে দিয়ে ফরয স্বলাত শেষে সম্মিলিত দুআকে উত্তম ঘোষণা করার দ্বারা রসূল ﷺ-এর উপলব্ধি জ্ঞান ও তাঁর আদর্শ 'তোমরা ঠিক সেইভাবে স্বলাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে স্বলাত আদায় করতে দেখেছ' (বুখারী) কে ম্লান ও তুচ্ছজ্ঞান করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে শরীয়ত সম্পর্কে যাঁদের প্রকৃত জ্ঞান আছে, তাঁরা জানেন যে, কোন জিনিসকে হারাম প্রমাণ করতে হলে 'নিষেধের দলীল' চাই। কিন্তু কোন ইবাদত প্রমাণ করতে হলে 'প্রমাণের দলীল' চাই; নিষেধের দলীল নয়। যদি এমনটা হয়, যেমন তাঁরা দাবী করেছেন, তাহলে তো মীলাদ, সমবেত দরূদ, জাশনে ঈদে মীলাদুন্নাবী, কবরে আযান দেওয়া, চাল্লিশা করা ইত্যাদি সবই জায়েয হয়ে যাবে। কেননা, এ সব নিষেধ হওয়ার ব্যাপারে কোন দলীল নেই।

রসূল ﷺ-এর প্রতি স্বলাত ও সালাম পড়তে বলা হয়েছে। কোন সময়ের সাথে সীমায়িত করা হয়নি। স্বলাত ও সালাম তো মূলতঃ রসূল ﷺ-এর কল্যাণ কামনা করে দুআ। ফরয স্বলাত শেষে দুআ কবুল হয়। জামাআতের দুআ বেশী করে কবুল হয়। অতএব ফরয স্বলাত শেষে সমস্বরে রসূল ﷺ-এর প্রতি দুআ (দরূদ) পাঠ করাতে আপত্তি কোথায়? আপনি জানেন, এভাবে কত বড় ফিতনার দরজা আপনারা উন্মুক্ত করে চলেছেন?

কোন আমলকে বিদআত প্রমাণ করার জন্য বড় প্রমাণ হল তা শরীয়তে নেই। কেননা নবী মুহাম্মাদ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের ব্যাপারে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।" *(বুখারী মুসলিম, মিশকাত১৪০নং)*

আব্দুল হাকীম সাহেব লিখেছেন, **'ফরয নামাযের পরেই যে বাধার সময় সীমা চলে আসছে, তা কোরানে বলে না। কোরান বলে, পারলে যেভাবেই হোক দোয়া করো, তা আমি কবুল করে নিই।'**

'পারলে যেভাবেই হোক দোয়া করো।' এ কথা আল-কুরআনের কোথায় আছে বলতে পারেন? কুরআন তো বলে,

{قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} (٣١) سورة آل عمران

অর্থাৎ, (হে নাবী) ঘোষণা করে দিন, আল্লাহকে যদি তোমরা ভালবাস, তাহলে তোমরা আমার ইত্তিবা (পদাঙ্কানুসরণ) কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন। *(আলে ইমরান ৩১ আয়াত)*

কুরআন বলে, রসূল তোমাদের আদর্শ। তিনি যেমন করে ও যখন যেভাবে ইবাদাত করেছেন ও করতে বলেছেন, তেমনি করে করো।

কুরআন বলে, স্বলাত আদায় কর। কুরআন এ কথা বলে না যে, **'পারলে যেভাবেই হোক স্বলাত আদায় করো।'**

কুরআন বলে, তোমরা হজ্জ কর। কুরআন এ কথা বলে না যে, **'পারলে যেভাবেই হোক হজ্জ করো।'**

তাহলে তো সব 'মাতুরীদী' মার্কা যার যা ইচ্ছা তাই শুরু হয়ে যাবে।

ফরয স্বালাতের পরের সময়টা যিক্‌র ও অযীফার সময়। এই জন্যই ইমাম বুখারী বাব বেঁধেছেন, 'বাবুদ দুআই বা'দাস স্বালাহ' (স্বালাতের পরে দুআর অধ্যায়)। আর তাতে যে দু'টি হাদীস এনেছেন (হাদীস নং ৬৩২৯ ও ৬৩৩০) সে দুটি যিক্‌র ও দুআ সম্বলিত। তাতে হাত তুলে (প্রার্থনামূলক) দুআর কথা নেই। ইমাম বুখারী তো এঁদের মত জাঁদরেল 'মুহদিস' ছিলেন না; তিনি ছিলেন প্রকৃত মুহাদ্দিস। সে জন্য তাঁর এই যোগ্যতা না থাকারই কথা।

যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ-এর আদর্শ ছিল ফরয স্বলাত শেষে যিক্‌র-আযকার করা। তাই ভয় হয় যে, তা বাদ দিয়ে অথবা তার সাথে কথিত মোনাজাতের অনুষ্ঠান করলে তাঁর আদর্শ-বিরোধী কাজ হবে এবং তা তাঁর কথন অনুযায়ী প্রত্যাখ্যাত হবে। যাতে তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমাদের এ (শরীয়তের) ব্যাপারে নতুন কিছু উদ্ভাবন করে যা ওর অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত।" *(বুখারী মুসলিম, মিশকাত১৪০নং)* "যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যার উপর আমাদের কোন নির্দেশ নেই তা পরিত্যাজ্য।" *(মুসলিম ১৭১৮-নং)*

(৩) 'প্রশ্নোত্তরে ফরয নামাযের পর দোওয়া'র তিনটি স্থানে ২৮, ২৯ ও ৪০ পৃষ্ঠায় এবং 'সালাতে হাকিম ঃ দোয়ায়ে হাকিম'-এর ৪৫ পৃষ্ঠায় যা লিখা আছে, তার ভাবার্থ হল যে, উলামায়ে উসূলের নিকট হতে এটা প্রমাণিত বিষয় যে, 'আম শব্দের বিধানকে আমই রাখতে হবে। বিনা দলীলে তাকে নির্দিষ্ট করা যাবে না। অতএব কুরআন মাজীদের আয়াত ও সহীহ হাদীসগুলিতে যদিচ কোন ব্যক্তি ও স্থানকে কেন্দ্র করে সম্মিলিতভাবে অথবা একাকী হাত তুলে দুআর কথা বর্ণিত হয়েছে, তা কিন্তু ঐ ব্যক্তি ও স্থানের সাথে নির্দিষ্ট করা যাবে না। বরং তার বিধানকে 'আম' রাখতে হবে। (কুরআন মাজীদ, উর্দু অনুবাদ ব্যাখ্যা সহ সঊদী আরবের ছাপা পৃঃ ৮৩)

তাঁরা বলেন, দুআর তাকীদ ও ফযীলত, যা 'আম'ভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা কোন দলীল ছাড়া কোন সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করা যাবে না। যেমন শায়খ ইবনে উষাইমীন (রঃ) বলেছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, যে যে ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যক্তির জন্য বা বিশেষ কারণে সংঘটিত দুআ অনুষ্ঠিত হয়েছে, সে ক্ষেত্র ও ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট না হয়ে অনুরূপ প্রয়োজনে সে দুআসমূহের পুনরাবৃত্তি ঘটানো যাবে। এটাই হল উপরে বর্ণিত দাবীর যথার্থ ব্যাখ্যা। 'আম'-এর অর্থ এটা নয় যে, সর্বক্ষেত্রের জন্য তা প্রযোজ্য হবে। তাহলে পেশাব-পায়খানার পরের দুআ, স্ত্রী-সহবাসের পূর্বে দুআ, সফরে নির্গমনাবস্থায় দুআ, আযানের শেষে দুআ, নতুন পোষাক পরিধান কালীন দুআ, আযানের শেষের দুআ, অন্যের বাড়িতে দাওয়াতী আহার ভক্ষণের পরের দুআ এবং সকাল-সন্ধ্যায় পঠিতব্য বিশেষ দুআ ইত্যাদিতে হাত উঠানো ও তা জামাআত সহকারে করাটা উত্তম বলে বিবেচিত হবে। আশা করি এমনটা করা হযরত মওলানাদ্বয় স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। শুধুমাত্র জনগণমন নমঃ করতে গিয়ে উসূলের অপপ্রয়োগ ক'রে চলেছেন।

আসুন! যে হক ও সত্য কথার বাতিল প্রয়োগ হচ্ছে, তার মূল তথ্য ঐ তাফসীরে কি বর্ণিত হয়েছে - তা একবার পড়ে নেওয়া যাক।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ} (٢٠٧) سورة البقرة

পক্ষান্তরে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আত্মবিক্রয় করে দেয়।

এই আয়াত সম্পর্কে বলা হয় যে, সুহায়ব রূমী ﷺ-এর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। যখন তিনি হিজরত করেন, তখন মক্কার কাফেররা বলল, এই ধন-সম্পদ এখানকারই উপার্জিত বিধায় আমরা তা সাথে করে নিয়ে যেতে দিবো না। সুহায়ব ﷺ সমস্ত ধন-সম্পদ তাদেরকে সমর্পণ ক'রে দ্বীন নিয়ে রাসূল ﷺ-এর নিকটে উপস্থিত হয়ে গেলেন। তিনি তাঁর ঘটনা শুনে বললেন, "সুহায়ব অতীব লাভদায়ক ব্যবসা করেছে।" কথাটি তিনি দু'বার বলেছিলেন। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* কিন্তু এ আয়াতও ব্যাপক অর্থের, যা সমস্ত মু'মিন, আল্লাহভীরু এবং দুনিয়ার মোকাবেলায় দ্বীনকে প্রাধান্য দানকারী সকলকেই শামিল করে থাকে। কেননা, কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হওয়া সমস্ত আয়াতের ব্যাপারে নীতি হল, العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب. 'বাচ্যার্থের ব্যাপকতাই লক্ষণীয়, অবতীর্ণের কারণবিষয়ক ঘটনার বিশেষত্ব নয়'। অর্থাৎ, আয়াতের যে অর্থ তার ব্যাপকতাকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে, বিশেষ কোন কারণে নাযিল হয়ে থাকলেও অর্থ কেবল তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হবে না। সুতরাং আখনাস বিন শুরাইক (যার কথা পূর্বের আয়াতে এসেছে) মন্দ চরিত্রের একটি নমুনা। যারাই এই চরিত্রের অধিকারী হবে, তারা সকলেই তার শ্রেণীভুক্ত হবে। অনুরূপ যারা উত্তম গুণাবলী এবং পূর্ণ ঈমানের গুণে গুণান্বিত হবে, তাঁদের সকলের জন্য নমুনা হবেন সুহায়ব ﷺ।

পক্ষান্তরে ইবাদত ও আহকামের ক্ষেত্রে নীতি ভিন্নরূপ, যেরূপ হুযুর তফসীর থেকে বুঝেছেন। অবশ্য ঐ বুঝের ব্যাখ্যায় যা বুঝাতে চেয়েছেন, তা এই নীতির পরিপন্থী। আল্লাহর রসূল ﷺ সর্বদা যিক্‌র করতেন (মুসলিম, প্রশ্নোত্তরে ফরয নামাযের পর দোওয়া পৃঃ ৪৪) তাই বলে আপনি পারেন কি প্রত্যেক নামাযের পরে জামাআতবদ্ধভাবে নির্দিষ্ট সংখ্যায় যিক্‌র করতে। আপনি পারলেও আল্লাহর নবী ﷺ-এর সাহাবী ইবনে মাসঊদ তা বিদআত বলেছেন ঃ-

আম্র বিন সালামাহ বলেন, ফজরের নামাযের পূর্বে আমরা আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ-এর বাড়ির দরজায় বসে থাকতাম। যখন তিনি নামাযের জন্য বের হতেন, তখন আমরা তাঁর সাথে মসজিদে যেতাম। (একদা ঐরূপ বসেছিলাম) ইতিমধ্যে আবু মূসা আশআরী আমাদের নিকট এসে বললেন, 'এখনো কি আবূ আব্দুর রহমান (ইবনে মাসঊদ) বের হন নি?' আমরা বল্লাম, 'না।' অতঃপর তাঁর অপেক্ষায় তিনিও আমাদের সাথে বসে গেলেন। তারপর তিনি যখন বাড়ি হতে বের হয়ে এলেন, তখন আমরা সকলে তাঁর প্রতি উঠে দন্ডায়মান হলাম। আবূ মূসা আশআরী তাঁর উদ্দেশ্যে বললেন, 'হে আবু আব্দুর রহমান! আমি মসজিদে এক্ষনি এমন কাজ দেখলাম, যা অদ্ভুত বা অভূতপূর্ব। তবে আলহামদুলিল্লাহ, আমি তা ভালই মনে করি।' তিনি বললেন, 'কি সেটা? ' (আবু মূসা) বললেন, 'যদি বাঁচেন তো দেখতে পাবেন; আমি মসজিদে এক সম্প্রদায়কে এক-এক গোল বৈঠকে বসে নামাযের প্রতীক্ষা করতে দেখলাম। তাদের হাতে রয়েছে কাঁকর। প্রত্যেক মজলিসে কোন এক ব্যক্তি অন্যান্য সকলের উদ্দেশ্যে বলছে, একশত বার 'আল্লাহু আকবার' পড়। তা শুনে সকলেই শতবার তকবীর পাঠ করছে। লোকটি আবার বলছে, একশত বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়। তা শুনে সকলেই শতবার তাহলীল পাঠ করছে। আবার বলছে, একশত বার 'সুবহানাল্লাহ' পড়। তা শুনে সকলেই শতবার তসবীহ পাঠ করছে।' তিনি (ইবনে মাসঊদ) বললেন, 'আপনি ওদেরকে কি বললেন?' আবু মূসা বললেন, 'আপনার রায়ের অপেক্ষায় আমি ওদেরকে কিছু বলিনি।' তিনি বললেন, 'আপনি ওদেরকে নিজেদের পাপ গণনা করতে কেন আদেশ করলেন না এবং ওদের পুণ্য

বিনষ্ট না হবার উপর যামানত কেন নিলেন না?'

আম্র বলেন, অতঃপর আমরা তাঁর সাথে চলতে লাগলাম। তিনি ঐ সমস্ত গোল বৈঠকের কোন এক বৈঠকের সম্মুখে পৌঁছে দন্ডায়মান হয়ে বললেন, 'আমি তোমাদেরকে একি করতে দেখছি?' ওরা বলল, 'হে আবু আব্দুর রহমান! কাঁকর, এর দ্বারা তকবীর, তহলীল ও তসবীহ গণনা করছি।' তিনি বললেন, 'তোমরা তোমাদের পাপরাশি গণনা কর, আমি তোমাদের জন্য যামিন হচ্ছি যে, তোমাদের কোন পুণ্য বিনষ্ট হবে না। ধিক্ তোমাদের প্রতি হে উম্মতে মুহাম্মাদ! কি সত্বর তোমাদের ধ্বংসের পথ এল! তোমাদের নবীর সাহাবাবৃন্দ এখনও যথেষ্ট রয়েছেন। এই তাঁর বস্ত্র এখনো বিনষ্ট হয়নি। তাঁর পাত্রসমূহ এখনো ভগ্ন হয়নি। তাঁর শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! তোমরা এমন মিল্লাতে আছ যা মুহাম্মাদ ﷺ-এর মিল্লাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অথবা তোমরা ভ্রষ্টতার দ্বার উদ্‌ঘাটনকারী?!' ওরা বলল, 'আল্লাহর কসম, হে আবু আব্দুর রহমান! আমরা ভালরই ইচ্ছা করেছি।' তিনি বললেন, 'কিন্তু কত ভালোর অভিলাষী ভালোর নাগালই পায় না! অবশ্যই আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, "এক সম্প্রদায় কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তাদের ঐ পাঠ (তেলাঅত) তাদের কণ্ঠ অতিক্রম করবে না।" আর আল্লাহর কসম! জানি না, সম্ভবতঃ তাদের অধিকাংশই তোমাদের মধ্য হতে।'

অতঃপর তিনি সেখান হতে প্রস্থান করলেন। আম্র বিন সালামাহ বলেন, 'নহরওয়ানের দিন ঐ বৈঠকসমূহের অধিকাংশ লোককেই খাওয়ারেজদের সাথে দেখেছিলাম। যারা আমাদের (হযরত আলী ও অন্যান্য সাহাবাদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ লড়ছিল।' *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২০০৫নং)*

বুঝা গেল এই যে, কোন আম ইবাদত ইচ্ছামত সময় ও পদ্ধতিতে করা যায় না; যদি না সে পদ্ধতি শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

(৪) হযরত মওলানাদ্বয় নিজেদের পান্ডিত্যের গভীরতার প্রমাণ দিতে গিয়ে এমন সব শিশুসুলভ কথা লিখেছেন, যা পড়ে সত্যিই হতবাক হতে হয় যে, একজন শিক্ষক এমন কথা কিভাবে লিখতে পারেন?

'প্রশ্নোত্তরে ফরয নামাযের পর দেওয়া' ১৫ পৃষ্ঠায় জনাব মাঝহারুল ইসলাম সাহেব লিখেছেন, **'জামাআত সহকারে দোওয়া ফরয। কারণ উল্লিখিত আয়াতে ক্রিয়াগুলি বহুবচন দ্বারা বর্ণিত।'**

'সালাতে হাকিম ঃ দোয়ায়ে হাকিম' ৩৬ পৃষ্ঠায় আব্দুল হাকিম সাহেব লিখছেন, (গ) **'জামায়াত সহকারে দোয়া করা। কারণ, সূরা মুমিনের ৬০নং আয়াতে ক্রিয়াগুলি**

বহুবচন দ্বারা বর্ণিত।'

কিন্তু জমার সীগা মাত্রই জামাআত প্রমাণ করে না। আরাবী ভাষায় কর্তা দুয়ের অধিক হলেই জমার সীগা বা বহুবচন ব্যবহার হয়। তাই বলে কার্যক্ষেত্রে তার রূপায়ন জামাআত ছাড়া হবে না, এমনটা একমাত্র আরাবী ও কুরআনের বাচনভঙ্গী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয় এমন ব্যক্তিই করতে পারে। যদি সেটি জামাআতের জন্যই ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাহলে তার পৃথক দলীল বা অব্যয় থাকতে হবে।

লক্ষ্য করুন ঃ-

{وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ} (٤٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা যথাযথভাবে স্বলাত পড় ও যাকাত দাও এবং রুকূকারীদের সঙ্গে রুকূ কর। *(সূরা বাক্বারাহ ৪৩ আয়াত)*

{وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ} (١٠٣) سورة آل عمران

অর্থাৎ, তোমরা সকলে আল্লাহর রশি (ধর্ম বা কুরআন)কে শক্ত করে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। *(সূরা আলে ইমরান ১০৩ আয়াত)*

{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا} (٦١) سورة النـور

অর্থাৎ, তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথক পৃথকভাবে আহার কর তাতে তোমাদের জন্য কোন অপরাধ নেই। *(সূরা নূর ৬১ আয়াত)*

সুতরাং যে কোনও আদেশ পালন কিভাবে করতে হবে; জামাআতবদ্ধভাবে, না এককভাবে তা জানার জন্য পৃথক অব্যয় বা দলীল যা আল্লাহর রসূল ﷺ হতে প্রমাণিত হতে হবে। এটাই হচ্ছে শরীয়তের নীতি তথা আরাবী ভাষার নিয়ম। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ} (١١٠) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর। *(সূরা বাক্বারাহ ১১০ আয়াত)*

{وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ} (٣١) سورة الأعراف

অর্থাৎ, তোমরা পানাহার কর। *(সূরা আ'রাফ ৩১ আয়াত)*

{وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ} (٩٠) سورة هود

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর অতঃপর তাঁর নিকট তওবা (প্রত্যাবর্তন) কর। *(সূরা হূদ ৯০ আয়াত)*

{وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} (٦٠) سورة غافر

অর্থাৎ, তোমরা আমার কাছে দুআ কর, আমি তা কবুল করব। *(সূরা মু'মিন আয়াত)*

প্রিয় পাঠক! উল্লেখিত অর্থসমূহ বহুবচন ক্রিয়া দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। আপনিই বলুন, ঐগুলি কি সব জামাআতবদ্ধভাবে হতে হবে? এগুলির ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের আমল কি ধরনের আছে? যদি জমার সীগার জন্য একসাথে করার নির্দেশ আছে বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে নীচের আয়াতগুলির অর্থ কিভাবে রূপায়িত হবে, দয়া করে বই লিখে জানাবেন।

{فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء} (٣) سورة النساء

অর্থাৎ, সুতরাং নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে; দুই, তিন অথবা চার (জামাআতবদ্ধভাবে) বিবাহ কর। *(সূরা নিসা ৩ আয়াত)*

{نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (٢٢٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমাদের স্ত্রী তোমাদের ক্ষেতস্বরূপ, সুতরাং তোমাদের ক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা (জামাআতবদ্ধভাবে) গমন কর!!! *(সূরা বাক্বারাহ ২২৩ আয়াত)*

{فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ} (١٨٧) سورة البقرة

অর্থাৎ, --- সুতরাং তোমরা এখন তাদের সাথে (জামাআতবদ্ধভাবে) সঙ্গম কর!!! *(সূরা বাক্বারাহ ১৮৭ আয়াত)*

{فَطَلِّقُوهُنَّ} (١) سورة الطلاق

অর্থাৎ, তাদেরকে (জামাআতবদ্ধভাবে) তালাক দাও। *(সূরা ত্বালাক ১ আয়াত)*

{وَآتُواْ الزَّكَاةَ} (٤٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা (জামাআতবদ্ধভাবে) যাকাত প্রদান কর। *(সূরা বাক্বারাহ ৪৩ আয়াত)*

{وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً} (٤٢) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, তোমরা সকাল-সন্ধ্যায় (জামাআতবদ্ধভাবে) তাঁর তসবীহ পড়। *(সূরা আহযাব ৪২ আয়াত)*

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ —— وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ} (٦) سورة المائدة

অর্থাৎ, তোমরা (জামাআতবদ্ধভাবে) ওযূ কর ---- গোসল কর। *(সূরা মাইদাহ ৬ আয়াত)*

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (٥٦) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর উপর (জামাআতবদ্ধভাবে) দরূদ ও সালাম পড়। *(সূরা আহযাব ৫৬ আয়াত)*

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}

অর্থাৎ, জুমআর আযান হলে তোমরা (জামাআতবদ্ধভাবে) আল্লাহর যিকরের জন্য সত্বর যাও এবং ক্রয়-বিক্রয় বর্জন কর। *(সূরা জুমুআহ ৯ আয়াত)*

উপরের অনুবাদসমূহ হাযরাতুল আল্লাম আব্দুল হাকিম ও মাঝহারুল ইসলাম সাহেবানের দাবীর ভিত্তিতে করা হল। আশা করি তাঁরা এই অনুবাদে আনন্দিত হয়ে আয়াতের দাবী অনুযায়ী আমল শুরু করে দেবেন। কিন্তু এ অনুবাদ যে ঠিক নয়, তা সকলেই অনুভব করছেন। উল্লেখিত আদেশসমূহ জামাআতবদ্ধভাবে কার্যকরী করার অর্থ নিতে হলে সুন্নাতে রসূল হতে তার স্বতন্ত্র দলীল পেশ করতে হবে।

বলা বাহুল্য, বহুবচনের শব্দ দ্বারা জামাআতী দুআ প্রমাণিত হয় না।

তাছাড়া শুধু জামাআতের সাথেই নয়; বরং একাকী দুআ করলেও মহান আল্লাহ কবুলের ওয়াদাহ দিয়েছেন। ঐ দেখুন, মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} (١٨٦) سورة البقرة

অর্থাৎ, আমার দাসগণ যখন আমার (অবস্থান) সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন তুমি বল, আমি তো কাছেই আছি। যখন <u>কোন প্রার্থনাকারী</u> আমাকে ডাকে, আমি <u>তার</u> ডাকে সাড়া দিই। (কেউ আমার কাছে দুআ করলে, আমি তার দুআ কবুল করি।)

এখানে একবচন শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে।

কুরআন মাজীদের বিভিন্ন দুআয় কোথাও একবচন এবং কোথাও বহুবচন শব্দ ব্যবহার হয়েছে, আর তার মানে এই নয় যে, দুআ একাকী করতে হবে অথবা জামাআতবদ্ধভাবে করতে হবে। কিভাবে করতে হবে, তা জানতে হলে নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর আদর্শ আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে। নিজের পক্ষ থেকে অনুমান বা ক্বিয়াস করে নয়। অতএব নির্দ্বিধায় এ কথা বলা যেতে পারে যে, **'সূরা মু'মিনের ৬০নং ক্রিয়াগুলি বহুবচন দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে'** বলেই জামাআতী মুনাজাত প্রমাণ হয় না। তাছাড়া আয়াতে তো ফরয স্বলাতের পরের কথার নামগন্ধও নেই।

(৫) বাকী থাকল মুফতীগণের দলীলবিহীন ফতোয়া, তা কেউ মানতে বাধ্য নয়। যেমন ফাতওয়া রাহীমিয়া ও বেহেশ্তী গাওহারের কথা। যা হানাফী মযহাবের মুফতী সাহেবানদের মস্তিস্ক-প্রসূত ফতোয়া, তা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর অনুসারী 'আহলে হাদীস' উলামা ও জনগণ কেন মানবেন? হানাফী ফতোয়ার কথা উল্লেখ করেছেন

আব্দুল হাকিম সাহেব তাঁর পুস্তিকার ১৪ ও ২৪-২৬ পৃষ্ঠায়।

আমরা 'আহলে হাদীস' আমরা কারো তাক্বলীদ (অন্ধানুকরণ) করি না, দলীল জেনে অনুসরণ করি মাত্র। ইবনে তাইমিয়্যাহ বা ইবনুল কাইয়েমের তাকলীদ নয়; বরং তাকলীদ হতে হবে একমাত্র কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর। যদি কারও উক্তি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর অনুকূলে হয়, আর যদি তাঁর কথা মেনে নেওয়া হয়, তাহলে প্রকৃতপক্ষে সেখানে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহকেই মানা হয়।

আমাদের জন্য বৈধ নয় দুআ জায়েয করার জন্য আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ)এর তাকলীদ করা, যেমন বৈধ নয় মাগরিবের আগে দু' রাকআত নফল স্বলাত প্রমাণ করার জন্য তাঁর তাকলীদ করা। যেহেতু তিনি ঐ স্বলাতকে বিদআত বলেননি। আমাদের উচিত, প্রত্যেকের দলীল দেখে বিচার করা। তাঁর মত যদি দলীলের অনুকূলে হয়, তাহলে তা মেনে নেওয়া।

এখানে একটি সহীহ হাদীসের উপস্থাপনা বিষয়টি বুঝার জন্য সহায়ক হবে ঃ-

ইমরান বিন হুসাইন ﷺ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ (একদা) আসরের স্বলাত পড়লেন ও তাতে তৃতীয় রাকআতে সালাম ফিরালেন। অতঃপর তিনি নিজ গৃহে প্রবেশ করলেন। খিরবাক্ব নামক (একজন সাহাবী) যাঁর হাত কিছুটা লম্বা ছিল তিনি তাঁর নিকটে গেলেন ও বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! (স্বলাত কি আজ থেকে কম হয়ে গেছে, না আপনি ভুলে গেছেন?)'

এ কথা শুনে তিনি রাগান্বিত হয়ে নিজের চাদরকে টানতে টানতে লোকেদের কাছে পৌঁছলেন এবং তাঁদেরকে বললেন, "এই লোকটা কি সত্য বলছে?" তাঁরা বললেন, 'জী হ্যাঁ।' তারপর তিনি এক রাকআত আদায় করলেন, তারপর সালাম ফিরলেন। তারপর দুটি সাজদাহ করলেন, অতঃপর সালাম ফিরলেন। *(মুসলিম, মিশকাত হাদীস নং ১০২১)*

অন্য বর্ণনায়, মুক্তাদী হিসেবে আবূ বাক্র, উমার ও অন্যান্য বিশিষ্ট সাহাবীবৃন্দ ﷺ উপস্থিত ছিলেন। যাঁদের কথা বলার সাহস হয়নি। *(বুখারী)*

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ-এর বর্ণনায় যুহরের স্বলাতে ভুল হওয়ার কথা আছে। তাতে বাড়তি কথা আছে, "আমি তোমাদের মত মানুষ, আমি ভুলে যাই; যেমন তোমরা ভুলে যাও। সুতরাং আমি ভুলে গেলে তোমরা স্মরণ করিয়ে দেবে।" *(বুখারী-মুসলিম, মিশকাত হাদীস নং ১০১৬)*

এখানে ঘটনাটি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হল, ব্যক্তি যত বড়ই হন না কেন, তাঁর কোন কথা বা কাজ দলীল-সম্মত না হলে তা মানা যাবে না। আবূ বাক্র ও উমারের এবং অন্যান্য সাহাবীগণের আচরণ আল্লাহর রসূলের পছন্দ হয়নি, সে কারণেই তিনি

রাগান্বিত হয়েছিলেন। অতিভক্তি ও অন্ধভক্তি মানুষের হকপথ-প্রাপ্তির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সে জন্য কোন বড় আলেমের ফতোয়াতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। মুফতী মুহাম্মাদ শফী' হানাফী তাঁর তাফসীর 'মাআরিফুল কুরআন'-এ সূরা মুহাম্মাদের শেষ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, আয়াতটি ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর সহচরবৃন্দের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে! যাঁরা এমন মুফতীগণের প্রোপাগাণ্ডাতে জ্ঞানশূন্য হন ও চোখে সরষের ফুল দেখতে শুরু করেন, তাদের জন্য আমাদের পরামর্শ, 'কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী হন।'

(৬) বাকী থাকল, হাসান বাসরী ও তাঁর পড়শীর কথা। তা জানি না যে, তা ঠিক না বেঠিক? তাছাড়া তাতে হাত তোলার কথাও নেই। নচেৎ সেই 'আ-সা-র' কোন হাদীসগ্রন্থে আসেনি কেন? যে কোন ইতিহাস গ্রন্থ বা গ্রন্থের ফুটনোট (হাশিয়াহ) থেকে বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা পেশ করে ইবাদতের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রমাণ করা যায় না।

উদাহরণ স্বরূপ সালামের ফযীলত এসেছে। এখন আপনার সঙ্গে আমার দেখা হল মসজিদে, স্বলাত শেষে সালাম ফিরার পর দেখছি আপনি আমার পাশে। আমি আপনাকে সালাম করলাম, মুসাফাহা করলাম। এটি জায়েয।

কেউ যদি বলে, প্রত্যেক ফরয স্বলাতের পর প্রত্যেক মুসল্লীর একে অপরের সাথে সালাম-মুসাফাহা করা জায়েয বা মুস্তাহাব। তাহলেই হবে মুশকিল। এখন যদি কোন সাহাবী বা তাবেয়ী থেকে বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা এনে ফরয স্বলাতের পর সালাম-মুসাফাহা মুস্তাহাব প্রমাণ করতে চান, তাহলে তা নিশ্চয় গ্রহণযোগ্য নয়; যতক্ষণ না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোন বয়ান পাওয়া যাবে। নিষেধ না থাকলেও ঐ অভ্যাস বিদআত বলে পরিগণিত হবে।

হযরতুল আল্লাম আব্দুল হাকীম ও মাঝহারুল ইসলাম সাহেবান ফাতাওয়া সানাইয়্যাহ ও নাযীরিয়্যাহ হতে একাধিকবার সম্মিলিত দুআর সপক্ষে ফাত্ওয়া নকল করেছেন। তাতে উল্লেখিত দলীলসমূহের যথাযোগ্য পোষ্টমর্টেম আমরা করে দিয়েছি। হকের প্রতি রুজুর সদিচ্ছা থাকলে, আশা করি তাঁরা এবার ক্ষান্ত হবেন।

জনগণ তথা তাকলীদে অভ্যস্ত উলামা প্রায়শঃ বলেন, 'তাঁরা কি বড় আলেম ছিলেন না? তাঁরা কি হাদীস বুঝেননি? তাঁদের ছাত্র হওয়ার যোগ্যতাও বিপক্ষের আলেমদের নেই' ইত্যাদি।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, তখন মূল বই-পত্রের চরম অভাব ছিল। হাদীস গবেষণা বর্তমান সময়ে যত সহজ হয়েছে, তখন তা ছিল না। বহু বই তো তখন মুদ্রিত আকারে পাওয়া যেত না। হাতে লিখে নকল করে কতটা সম্ভব বিজ্ঞজনেরা সহজেই অনুমান করতে পারছেন। সে জন্য তাঁরা অসহায় ছিলেন, তাঁরা অবুঝ ছিলেন

না। এ কারণেই সমস্ত আলিম এটাই লিখতে বাধ্য হন,

هذا ما عندي، والله أعلم بالصواب.

আমি যা বুঝেছি, তাই লিখেছি। প্রকৃত ঠিক কোনটা সেটা আল্লাহ জানেন। বইয়ের প্রথম থেকে জামাআতী দুআ সম্পর্কিত দলীলগুলির যে 'খাস্তা হাল' তা নিরীক্ষণ করার পর আশা করি মাওলানা সাহেবান নিজের ভ্রম সংশোধন করে নেবেন। আর তাতে তাঁদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন না হয়ে বর্ধনই হবে ইন শাআল্লাহ।

(৭) 'প্রশ্নোত্তরে ফরয নামাযের পর দোওয়া' বইয়ের ৪১ পৃষ্ঠায় 'যা-দুল মাআদ' ১ম খণ্ড ৬৬পৃঃ হতে একটি লম্বা ইবারত নকল করা হয়েছে। তাতে মহামতি লেখক জামাআতী দুআর প্রমাণ খুঁজে পেয়েছেন। সে জন্য খুশীতে আত্মহারা হয়ে শিরোনাম দিয়েছেন, **'এক নজরেই ভ্রান্তি দূর।'**

কিন্তু এটা যে ইসলাম-ভক্ত জনগণকে ধোকা দেওয়া বৈ কিছু নয় সেটা আমাকে বলতে হবে না। ওই আরাবী ইবারতের বাংলা অনুবাদ লেখক যা করেছেন, আমি হুবহু নকল করে দিচ্ছি। এরপর পাঠক নিজেই ঠিক করবেন যে, কোথায় সম্মিলিতভাবে অথবা একাকী হাত তুলে দুআর কথা আছে?

"অর্থাৎ, একটি লতিফা এই যে, নামাযী যখন নামায শেষ করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আলহামদো লিল্লাহ, আল্লাহু আকবার ইত্যাদি আযকার মাসনূনা শেষ করল তখন তার জন্য মুস্তাহাব হল নবী (সাঃ)এর উপর দরূদ পাঠ করা। তারপর সে ইচ্ছামত যে কোন দুআ করতে পারে। তার এই দোওয়া নামাযের পর হওয়ার জন্য মুস্তাহাব নহে বরং উহা দ্বিতীয় প্রকারের ইবাদত। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের হাম্দ ও সানা যিকির-আযকার ও নবী (সাঃ)এর উপর দরূদ পাঠ করল তখন তার জন্য দোওয়া করা মোস্তাহাব হল। তিরমিযীর বর্ণিত হাদীস ফোযালা বিন ওবাইদের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়।"

আরাবী ইবারতের অনুবাদ যদিচ সঠিক হয়নি। আর তার জন্য মূল লক্ষ্য বিঘ্নিত হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও এ কথা এই প্রমাণ করার জন্য নকল করলাম যে, এখানে বিতর্কিত বিষয়ের কোন নিষ্পত্তি নেই। অকারণ বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাছাড়া আণ্ডার লাইন ইবারতগুলি আরো একবার ভাল করে পড়ে দেখার জন্য অনুরোধ করছি।

(৮) 'ফাতাওয়া সানাইয়্যাহ'র ৫৭২ অথবা ৫৭৮পৃঃ হতে আবূ সাঈদ শারফুদ্দীন দেহলবী সাহেবের ফাতওয়া নকল করা হয়েছে যে,

نماز کے بعد کا وقت مبارک اور قبولیت دعا کا ہے، اس لئے شیطان ایسے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے تاکہ اس کے وسوسوں میں مبتلا ہوکر یہ دعا مانگنے سے محروم ہوجائیں ،اس لئے ایسے لوگ بیچارےمجبور ہیں یہ کرید میں رہتے ہیں، اور شیطان کا مقصد پورا ہوتا ہے-

('প্রশ্নোত্তরে ফরয নামাযের পর দোওয়া' ৩৬পৃঃ)

ফরয স্বলাত শেষে দুআ ও যিক্‌র করা সহীহ হাদীসে প্রমাণিত আছে। ঝগড়া তো এটা নিয়ে নয়। ঝামেলা হল 'ইমাম-মুক্তাদী মিলে জামাআতবদ্ধভাবে দুআ করা' নিয়ে। শারফুদ্দীন দেহলবীর উল্লেখিত ইবারতের কোন্ শব্দ দ্বারা আপনি এ অর্থ নিচ্ছেন যে, জামাআতবদ্ধভাবে দুআ করতে হবে। আপনি তো সুন্নাতে রসূল ﷺ-কে আপনার বইয়ের ৪৫ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন। কই? সেখানে তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাত উঠানোর কথা ও মুক্তাদিগণের 'আমীন-আমীন' বলার কথা নকল করলেন না। আর করতেও পারবেন না। আমরাও তো বলছি, আপনি যে নবীর উম্মত বলে দাবী করছেন, তাঁর সুন্নাত অনুযায়ী দুআ করুন। নতুন করে ভারতীয় সংস্করণ বের কেন করছেন? মক্কী-মাদানী সংস্করণ পছন্দ নয় বলেই তো?

تعصي الرسول وأنت تظهر حبه   هذا لعمري في الزمان بديع

لو كان حبك صادقاً لأطعته   إن المحب لمن يحب مطيع

রসূলের অবাধ্য হয়ে রসূল-প্রীতি প্রকাশ করছ, এ তো পৃথিবীতে এক অদ্ভুত বিষয়। যদি তোমার (রসূল) প্রেম সত্য হত, তাহলে তুমি তাঁর আনুগত্য করতে। কেননা, যে যাকে ভালবাসে, সে তার অনুগত হয়।

শারফুদ্দীন সাহেবের ভাষাতে কোন সংকট নেই। কিন্তু তাঁর কথাকে নকল করে কি এটা বুঝাতে চেয়েছেন যে, যাঁরা জামাআতবদ্ধভাবে ফরয স্বলাত শেষে দুআর বিপক্ষে, তাঁরা দুআই করেন না? যদি এমনটা করেন, তাহলে সাবধান! মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} (١٢) سورة الحجرات

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা বহুবিধ ধারণা হতে দূরে থাক; কারণ কোন কোন ধারণা পাপ। *(সূরা হুজুরাত ১২ আয়াত)*

রসূল ﷺ বলেছেন, إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث.

অর্থাৎ, কুধারণা হতে দূরে থাকো, কেননা, কুধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। *(বুখারী)*

মহান আল্লাহ বলেন, {فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى} (٣٢) سورة النجم

অর্থাৎ, নিজেকে শুদ্ধ ঘোষণা করো না। তিনি বিলক্ষণ জানেন কে বেশী আল্লাহ-ভীরু। *(সূরা নাজম ৩২ আয়াত)*

অপবাদ ও তার জবাব

(১) যারা মুনাজাত করে না, তারা আবূ জেহেল! (সঠিক আবূ জাহ্ল)

(সালাতে হাকিম ঃ দোয়ায়ে হাকিম ৮-পৃঃ)

এখানে যারা দুআ করতে নিষেধ করে, তাদেরকে আবু জাহ্ল বলা হয়েছে। কারণ আবূ জাহ্লই স্বলাত প্রতিষ্ঠিত করা হতে লোকেদেরকে নিষেধ করত। আর পূর্ণ স্বলাতটাই হচ্ছে দুআর সমষ্টি।

এ কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে যে, যারা স্বলাত পড়তে ও দুআ করতে তো নিষেধ করে না; বরং ফরয স্বলাতের পর হাত তুলে দুআকে শরীয়তে নেই বলে, শরীয়তে নব-আবিষ্কৃত বলে, বিদআত ও বর্জনীয় বলে। তারাও আবূ জাহ্ল!

{سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ }

সুবহানাল্লাহ! এটি একটি বড় ধরনের অপবাদ। এটি একটি ঝাল ধরানো বুহতান! কিন্তু তাঁরা তো দুআ করতে মানা করেন না। বরং ঐ স্বলাতরূপ দুআ করতেই আদেশ করেন, নিষেধ করেন না। যেহেতু স্বলাতই হচ্ছে দুআ। স্বলাত দুই শ্রেণীর দুআ দিয়ে সুসজ্জিত, সুবিন্যস্ত; (১) দুআয়ে যিক্র (যাতে আল্লাহকে স্মরণ করা হয়) ও (২) দুআয়ে মাসআলাহ (যাতে আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া হয়)। স্বলাত প্রতিষ্ঠাকারী যখন স্বলাত প্রতিষ্ঠা করে, তখন সে প্রভুর সাথে মুনাজাত করে। স্বলাতের ভিতরে ৮টি স্থানে প্রার্থনামূলক মুনাজাত করা হয়; (ক) বুকে হাত বাঁধা অবস্থায়, দুআয়ে ইস্তিফতাহ ও সূরা ফাতিহার মাধ্যমে, (খ) রুকূর অবস্থায়, (গ) সাজদাহর অবস্থায়, (ঘ) দুই সাজদাহর মাঝে, (ঙ) প্রথম তাশাহহুদে, (চ) শেষ তাশাহহুদে, (ছ) নবী ﷺ-এর জন্য স্বলাত ও সালাম ও (জ) দুআয়ে মা'সূরাহ।

সম্মিলিত মুনাজাতের বিরুদ্ধে ফাত্ওয়া দাতাগণ স্বলাতের পরেও দুআ করতে নিষেধ করেন না। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

(فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ)

অর্থাৎ, তারপর যখন তোমরা স্বলাত শেষ করবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ কর। *(সূরা নিসা ১০৩ আয়াত)*

ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে 'বাবুদ দুআই বা'দাস স্বালাহ' শিরোনাম বেঁধে যে হাদীস উল্লেখ করেছেন, তাতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, স্বলাতের পর দুআ হল, দুআয়ে যিক্র।

ইমাম-মুক্তাদী মিলে জামাআতী দুআও আপনি করতে পারেন। যে সব স্থলে

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন, যেমন জুমআহ ও ঈদের খুতবায় (হাত না তুলে) করতে পারেন, ইমাম-মুক্তাদী মিলে জামাআতী হাত তুলে দুআও ইস্তিস্কার জন্য জুমআর খুতবায় এবং আম বিপদ-আপদে কুনূতে নাযেলায় করতে পারেন। উল্লেখিত স্থানসমূহে সম্মিলিত দুআ করুন ও অন্যকে করতে উদ্বুদ্ধ করুন। কারণ, সেসব শরীয়ত-সম্মত।

তাঁরা যা শরীয়ত-সম্মত নয় বলেন, তা হল স্বলাত শেষে হাত তুলে জামাআতী দুআর অনুষ্ঠান। আর তা শুধু এই আশংকায় যে, নির্মল দ্বীনে যেন ভেজাল থেকে না যায়। আর এ জন্যই কি তাঁরা আবু জাহ্ল বা তার মত হয়ে গেলেন?!

মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} (٧٠) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও সঠিক কথা বল। *(সূরা আহযাব ৭০ আয়াত)*

(২) যারা মুনাজাত করে না, তারা ক্বাদারী!

মওলানা আব্দুল হাকিম তাঁর লিখিত বই 'সালাতে হাকিম ঃ দোয়ায়ে হাকিম'-এর ৫পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

'এঁরা তকদীরে বিশ্বাসী। (ক) যারা তাকদিরে বিশ্বাসী তাদেরকে অনেকে কাদরিয়া বলে। (খ) অনেক আরেফ বিল্লা দোয়াই করে না - নসিবের উপর ছেড়ে দেয়।--- (গ) হাদিস বুখারীতে একটা অধ্যায় কাদরিয়া বলে আছে। (ঘ) এমন কি এই গোত্র দোয়ায় একা একা হাতও তুলে না। (ঙ) এঁদের নিকট হাত তুলে দোয়া শেষে মুখমণ্ডলে মাসাহ বা মুখে হাত বুলানো নাই।'

(ক) যারা তাক্বদীরে বিশ্বাসী তাদেরকে 'কাদরিয়া' কেউ বলে না। তাহলে আপনি কি তাক্বদীরে বিশ্বাসী নন? তাক্বদীরে বিশ্বাস না করলে কেউ মুসলমান থাকতে পারে কি? অবশ্য তার সাথে তাদবীরেও বিশ্বাস রাখতে হবে। যারা তকদীরে অবিশ্বাসী, যারা বলে তাকদীর বলে কিছু নেই, তাদেরকেই 'ক্বাদারিয়াহ' বলে। যেহেতু তারা তাদবীরের উপর পূর্ণ নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে যারা কেবল তাক্বদীরে বিশ্বাসী ও তদবীরে অবিশ্বাসী তাদেরকে 'জাবারিয়্যাহ' (অদৃষ্টবাদী) বলে।

(খ) আপনার ধারণা কি 'কাদরিয়া' গ্রুপ দুআ করে না? কিন্তু আরেফ বিল্লাহ তো কাদরিয়ার বিপরীত। যারা নসীবের উপর ছেড়ে দেয়, তারা তো জাবারিয়্যাহ।

(গ) 'হাদিস বুখারীতে একটা অধ্যায় কাদরিয়া বলে আছে।' তাতে কি হয়েছে? তাতে কি বলা হয়েছে, 'কাদরিয়া' তাকদীরে বিশ্বাসী, অথবা তারা দুআতে হাত তুলে না, অথবা দুআর পরে মুখমণ্ডল মাসাহ করে না?

(ঘ) 'এই গোত্র' বলতে উদ্দেশ্য কারা? কাদরিয়ারা, নাকি তাঁরা, যাঁরা ফরয স্বলাতের পর হাত তুলে দুআ বিদআত বলছেন? নাকি আপনার মতে তাঁরাও 'কাদরিয়া' ও 'আরেফ বিল্লাহ'?

(ঙ) এ কাজও কি কাদরিয়াদের? সমাজকে কি বুঝাতে চেয়েছেন? সমাজের শিক্ষিত মানুষরা কি এই শ্রেণীর লিখাকে ক্ষমার চোখে দেখবেন? আপনার লিখাতে এত স্বতোবিরোধ কেন? আপনি লিখেছেন, 'এরা একা একা হাতও তোলে না।' আবার লিখেছেন, 'এদের নিকট হাত তুলে দোয়া শেষে মুখমণ্ডলে মাসাহ বা মুখে হাত বুলানো নাই।' তাহলে তো এঁরা হাত তুলেন। কিন্তু দুআ শেষে মুখমণ্ডলে এই জন্য হাত বুলান না যে, তাঁরা হলেন, আহলে হাদীস। কেননা, দুআর পরে মুখমণ্ডল মাসাহ করার প্রমাণে কোন সহীহ দলীল নেই। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত সমস্ত হাদীস যয়ীফ।

খাঁটি আহলে হাদীসের এই দলটি, যাঁরা কোন যয়ীফ হাদীসের উপর আমল করার পক্ষপাতী নন, তাঁদের ব্যাপারে আপনি যদি জানেন যে, (আরেফ বিল্লাহর মত) সত্যই তাঁরা কোন সময় দুআ করেন না, তাহলে জানতে হবে আপনার জ্ঞান বড় সীমিত। আর যদি জানেন যে, তাঁরা ফরয স্বলাতের পরে দুআয়ে যিক্র করে থাকেন এবং অন্য সময়ে দুআয়ে মাসআলাহ করে থাকেন, তাঁরা পলকের জন্যও মহান প্রতিপালকের রহমত থেকে অমুখাপেক্ষী নন, বরং প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর দয়ার মুখাপেক্ষী, তাঁরা তাকদীরে বিশ্বাস রেখে তাদবীর করেন এবং তাঁরা সকাতরে প্রার্থনা করেন, যথাসময়ে তাঁরা রবের অনুগ্রহ ও করুণা যাচনা করেন, তাহলে জেনেশুনে তাদেরকে 'কাদরী' (বা সঠিক অর্থে ঃ জাবারী) বানানো একটি মিথ্যা ও জঘন্য অপবাদ। এ অপবাদের ক্ষমা একমাত্র একটি পথেই হতে পারে; আর তা হল লিফ্‌লেট ছেপে ভুল স্বীকার করা ও তা জনসমাজে বিতরণ করা।

(৩) যারা মুনাজাত করে না, তাদের মূর্খামি ও ফিতনা!

আব্দুল হাকিম সাহেব লিখেছেন, 'অতএব দুআ বিষয়ে দ্বীনের বহু উৎস কোরআন (সঠিক ঃ কুরআন) মাজীদ ও সহী হাদিস থাকা সত্ত্বেও ------- যদি ফরয নামাযের পর জামায়াতী (শুদ্ধ ঃ জামআতী) দুআকে বিদআত বলে, তবে সেটা মূর্খামি ও ফিৎনা ছাড়া আর কি হতে পারে? বর্তমানে যাঁরা ফরয নামাযের পর ঈমাম ও মোক্তাদীগণের মিলিত দুআকে বিদআত ও না জায়েয বলছেন, তাঁরা সত্যিকারই বিপথগামী এমং মুসলীম সমাজকে বিভ্রান্তকারী!!!!!!'

একেবারে চরম ফাতওয়া, 'মূর্খামি?' ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ মূর্খ? ইমাম ইবনুল কাইয়েম মূর্খ? সউদী আরবের ফকীহ ও মুফতীগণ মূর্খ? আল্লামা নাসীরুদ্দীন আলবানী মূর্খ, ইবনে বায, ইবনে উষাইমীন, এঁরা সবাই মূর্খ? হারামাইনের ইমামগণ,

হাইআতু কিবারিল উলামা, ফাতাওয়া বিষয়ক আল-লাজনাহ আদ-দায়েমাহ, জামেআহ ইসলামিয়াহ (মদীনা), জামেআহ উম্মুল কুরা (মক্কা), জামেআতুল ইমাম, জামেআতুল মালিক সঊদ, (রিয়ায) জামেআহ সালাফিয়া (বানারস), জামেআহ ইবনে তাইমিয়্যাহ (বিহার), জামেআহ সানাবেল (দিল্লী) প্রভৃতি বিশ্বখ্যাত সালাফী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ মূর্খ? শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী মূর্খ? হাফেয শায়খ আইনুল বারী আলিয়াবী মূর্খ? দেশের মাদানীগণ সবাই মূর্খ? তাঁরা সবাই বিপথগামী এবং 'মুসলীম সমাজকে বিভ্রান্তকারী'? আল্লাহর কসম! এ তো বড় অদ্ভুত কথা! এ যেন,

رمتني بدائها وانسلت!

প্রতিপক্ষকে ক্ষান্ত করতে রাখালদের মত এই শ্রেণীর গালাগালি করা ও কাদা ছুঁড়াছুঁড়ি করা আলিমদের জন্য শোভনীয় নয়। আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী কাউকে মূর্খ বলেননি। যেহেতু যাঁরা উচ্চ পর্যায়ের আলিম, তাঁদের মাঝে আদব থাকবে, তাঁরা অপর আলিমকেও শ্রদ্ধা করবেন। কেননা, মর্যাদাশীল ব্যক্তিরাই মর্যাদাবান লোকেদেরকে চেনেন।

إنما يعرف من الناس ذا الفضل ذوه.

আপনি নিজেকে নিজের বাচন-ভঙ্গি দ্বারা বড় আলিম প্রমাণ করতে চেয়েছেন। অন্যদিকে ভুলে বসেছেন যে, এ বিশ্বে কত বড় বড় আলিম-উলামা রয়েছেন। কুরআনে কি অন্য মুমিনকে এভাবে স্মরণ করার আদব শিক্ষা দিয়েছে?

কোথায় কুরআনের সেই দুআর আদব? যেখানে বলা হয়েছে,

{وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا} (١٠) سورة الحشر

আর ফিতনা ছড়ানোর কথা বলছেন? উলামাগণ কখনো ফিতনা ছড়ান না। গভীর পানির মাছদের মধ্যে এই শ্রেণীর ফর্‌ফরানি দেখা যায় না। কিন্তু অল্প পানিতে পুঁটি মাছ ফর্‌ফর্ করে। ফাঁপা ঢেকির শব্দ বড়। খালি গাড়ির শব্দ বেশী। উভয় পক্ষের অল্পশিক্ষিত গোঁড়ারাই ফিতনা ছড়ায়। যারা জোর করে নিজের মত অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চায়, তারাই ফিতনা ছড়ায়। যারা দুআ করলে অথবা না করলে ইমামতি করতে বাধা প্রদান করে তারাই ফিতনাবাজ। যারা ফরয স্বলাতের পর মুনাজাত জরুরী মনে করে, যারা কেউ দুআ না করলে তাকে দুআ করতে আদেশ করে, অথবা কেউ তা করলে জোরপূর্বক বাধা দেয় তারাই ফিতনাবাজ। যারা তাদের ফতোয়া না মানলে অপর পক্ষকে জাহেল, সুবিধাবাদী, বিদআতী ইত্যাদি বলে ব্যঙ্গ করে ও সমাজকে উস্কিয়ে থাকে, সমাজের চোখে তাদেরকে ছোট করে নিজেকে 'হিরো' ও

অপরকে 'জিরো' প্রমাণ করে বেড়ায়, ফিতনাবাজ তারাই। যারা নিজেদের মর্যাদা বিলীয়মান এবং অপরের মর্যাদা বর্ধমান দেখে হিংসায় জ্বলে বিরোধিতায় তৎপর, আসলে তারাই ফিতনাবাজ। যারা ফরয স্বলাতের পর মুনাজাত করলে অথবা না করলে সিধা জাহান্নামে পাঠিয়ে থাকে, ফিতনা ছড়ায় তারাই।

তাছাড়া পূর্বেই বলা হয়েছে, সাধারণ দুআর দলীল দিয়ে ফরয স্বলাতের পর জামাআতী দুআকে প্রমাণ করা জ্ঞানবত্তা নয়। যেমন নবী ﷺ-এর প্রতি স্বলাত ও সালাম পাঠের আম দলীল দ্বারা ফরয স্বলাতের পর জামাআতী স্বলাত ও সালাম পাঠ প্রমাণ করাটাও পাণ্ডিত্য নয়। তসবীহ পাঠের ভূরি ভূরি দলীল উপস্থিত করে সিয়াম ইফতারীর পরে জামাআতী তসবীহ প্রমাণ করাও কোন 'শাইখুল হাদীস'-এর কাজ নয়।

(৪) হাত তুলে দুআর সমস্ত হাদীস যয়ীফ শুনে উনারা বলেন, যারা ফরয স্বলাতের পর হাত তুলে দুআ বিদআত বলছে, **তারাও অনেক যয়ীফ হাদীসের উপর আমল করে।** *(সালাতে হাকীম ঃ দোয়ায়ে হাকিম ১০পৃঃ)*

এটিও কিন্তু একটি অপবাদ। কারণ তাঁরা জেনেশুনে কোন সময়েই যয়ীফ হাদীসের উপর আমল করেন না। যে সকল উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, সে সকল হাদীসকে কেউ কেউ যয়ীফ বললেও আসলে অন্য সূত্রে অথবা সমষ্টিগত সূত্রে তা সহীহ লেগায়রিহ, হাসান অথবা হাসান লেগায়রিহ; যা মুহাদ্দিসীনদের নিকটে আমলযোগ্য।

শুধুমাত্র কাসীর বিন আব্দুল্লাহর হাদীসটিকে সামনে রেখে এ ব্যাপারে হাদীসবিশারদগণের কিছু মন্তব্য তুলে ধরা হল ঃ-

আল্লামা উবাইদুল্লাহ রহমানী লিখেছেন ঃ-

والحديث دليل على أنه يكبر في الأولى من ركعتي العيد سبعاً قبل القراءة وفي الثانية خمساً قبل القراءة، وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة، منهم الخلفاء الراشدون والتابعون والأئمة بعدهم، قال العراقي: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة، قال: هو مروي عن عمر وعلي وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر وابن عمر وابن عباس وأبي أيوب وزيد بن ثابت وعائشة، وهو قول الفقهاء السبعة من أهل المدينة وعمر بن عبد العزيز والزهري ومكحول، وبه يقول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد.

অর্থাৎ, "(কাসীর বিন আব্দুল্লাহর) হাদীসটি এই মর্মে দলীল যে, ঈদের দুই রাকআত স্বলাতের প্রথম রাকআতে কিরাআতের পূর্বে সাত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাকআতে কিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিতে হবে। সাহাবীদের উল্লেখযোগ্য অংশ

এদিকেই গিয়েছেন, যাঁদের মধ্যে খুলাফায়ে রাশেদীনও আছেন। তাছাড়া তাবেয়ী ও ইমামগণের মধ্যে (সিংহভাগ) এদিকেই রয়েছেন। ইরাক্বী বলেন, সাহাবী, তাবেয়ী ও ইমামগণের মধ্যে অধিকাংশ বিদ্যানগণের এটাই মত।

তিনি আরো বলেন, উমার, আলী, আবূ হুরাইরাহ, আবূ সাঈদ, জাবের, ইবনে উমার, ইবনে আব্বাস, আবূ আইয়ুব, যায়েদ বিন সাবিত, আয়েশাহ প্রমুখ হতে এ ব্যাপারে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ মতই মদীনার সাত ফিকাহবিদের, উমার বিন আব্দুল আযীযের, যুহরী ও মাকহূলের। ইমাম মালিক, আওযায়ী, শাফেয়ী ও আহমাদের মাযহাবও এটাই।" *(মিরআতুল মাফাতীহ ৫ম খণ্ড ৪৬পৃষ্ঠা)*

তিনি উক্ত মিরআতের ৪৭ পৃষ্ঠাতে আরো লিখেছেন,

هذا حديث صحيح أو حست صالح للاحتجاج، قال الحافظ العراقي: إسناده صالح، ونقل الترمذي في العلل المفردة عن البخاري أنه قال: إنه حديث صحيح، كذا في النيل (٢٨٢/٣).

..... ولم يكن حاجة إلى ذكر كلامهم ثم الرد عليهم بعد ما صححه أئمة هذا الشأن الجهابذة النقاد أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والبخاري، واحتج به الأئمة المجتهدزن.

অর্থাৎ, "এটি সহীহ অথবা হাসান হাদীস, দলীলের উপযুক্ত। হাফেয ইরাক্বী বলেন, এর সানাদ উত্তম। 'ইলালে মুফরাদাহ'তে ইমাম তিরমিযী, ইমাম বুখারী হতে নকল করেছেন যে, তিনি বলেছেন, হাদীসটি সহীহ। এ কথা নাইলুল আওত্বার (৩য় খণ্ড ২৮২পৃঃ) সহ (কয়েকটি গ্রন্থে) আছে। তাছাড়া যারা হাদীসটির বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছেন, তাদের কথা উল্লেখ করে খণ্ডনের কোন দরকার নেই, যখন আহমাদ বিন হাম্বাল, আলী ইবনুল মাদীনী ও বুখারীর মত জাঁদরেল হাদীস বিশেষজ্ঞগণ হাদীসটিকে 'সহীহ' বলেছেন এবং তাকে মুজতাহিদ ইমামগণ দলীল হিসেবে মেনে নিয়েছেন।"

সুতরাং আব্দুল হাকিম সাহেব যে মন্তব্য করেছেন, তা খুবই হাস্যকর।

সঊদী আরবে ফজরের সময় দুআয়ে কুনূত শুনে থাকলে, তা সত্য। কিন্তু তা ঐ কুনূত নয়, যা নিয়মিত শাফেয়ীরা করে থাকেন এবং যা আমাদের নিকট বিদআত। বরং তা দুয়ের মধ্যে এক। হয় রমযানের কিয়ামুল লাইলের কুনূত। আর না হয় কুনূতে নাযেলাহ। আর এ ক্ষেত্রে কেবল ফজরের স্বলাতেই হয় না, বরং অন্য স্বলাতেও হয়। যেমন বোসনিয়া, ইরাক ও ফিলিস্তীনের মুসলিমদের জন্য যথাসময়ে হয়েছিল।

(৫) যারা মুনাজাত করে না, তারাই বিদআতী!

মওলানা আব্দুল হাকিম সাহেব প্রসিদ্ধ বক্তা মওলানা হায়দার আলী সাহেবের হাওয়ালায় লিখেছেন, **'ফরয নামায বাদে, যৌথ ও একা হাত তুলে দোয়া করাকে যারা বিদাত বলেন, তারাই বিদাতী!'** *(সালাতে হাকিম ১৭পৃঃ)*

(বিদাত, বিদাতী নয়; বরং বিদআত ও বিদআতী)

এটা হল সেই শ্রেণীর অপবাদ, যা গায়ের ঝাল ঝাড়ার জন্য বলা হয়। যেমন একটি লোক এক মহিলার সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে গালি দিয়ে বলল, 'চুপ কর শালী।' তখন পাল্টা জবাবে মহিলাটিও রেগে তাকে বলল, 'তুই চুপ কর শালা!'

অনেক সময় মাতালকে 'মাতাল' বললে পাল্টা জবাবে মাতালও ভালো মানুষকে 'মাতাল' বলে গালি দিয়ে থাকে।

আসলে 'বিদআত' ও 'বিদআতী'র সংজ্ঞা অনুসারে এঁরা বিদআতী না হলেও পাল্টা জবাবে এঁদেরকে অপবাদ দিয়ে গায়ের ঝাল ঝাড়া ছাড়া আর কি হতে পারে?

তিনি আরো লিখেছেন, **'তাদের কথাগুলি নিজ নিজ মনগড়া একটি নতুন বিদআত। কারণ ঃ কোরআন মাজীদ এবং সহীহ হাদিস দ্বারা জামায়াত সহকারে দুআ করার কথা প্রমাণিত আছে এবং নাবী (সাঃ) উম্মতগণকে জামায়াত সহকারে দুআ করার উৎসাহ দান করেছেন।'** *(সালাতে হাকিম ৪০পৃঃ)*

এই জন্য যে যে স্থানে আল্লাহর নবী ﷺ ও সাহাবাগণ জামাআত সহকারে দুআ করে গেছেন, কেবল সেই সেই জায়গায় জামাআত সহকারে দুআ সুন্নত। পক্ষান্তরে ফরয স্বলাতের 'পরের সময়টা' দুআ কবুল হওয়ার উপযুক্ত সময় যদিও বলে গেছেন, তবুও তিনি ও তাঁর সাহাবাগণ দৈনিক পাঁচ অক্ত স্বলাতের মধ্যে একটিবারও কোন স্বলাতের পর জামাআতী মুনাজাত করেননি। বিশাল জামাআতের এই মুনাজাতের কথা কোন সাহাবী বর্ণনা করলেন না। অথচ তাঁরা জামাআতী স্বলাতের কত খুঁটিনাটি বিষয়াদি বর্ণনা করে গেছেন। আল্লাহর নবী ﷺ-এর জীবনে যা মাত্র দু'-একবার ঘটেছে তারও সূক্ষ্ম বর্ণনা দিয়েছেন তাঁরা, অথচ এতবড় একটি ফযীলতপূর্ণ জিনিস, যা মুসলিমদের দৈনন্দিন জীবনে পাঁচ পাঁচবার অনুষ্ঠিত হত, তার কথা একবারও কেউ বলে গেলেন না, এটা কি ভাববার কথা নয়?

বড় আশ্চর্য বিষয় যে, উনারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, দুআ ইবাদতের মগজ (সার), মুসলমানদের জামাআত (?)কে ধরে থাকতে বলেছেন, তিনি ও সাহাবীগণ সূরা ফাতিহার পর আমীন বলেছেন, কুনূত ও ইস্তিস্কার দুআতে জামাআতী দুআ করেছেন এবং ফরয স্বলাতের পর দুআ কবুল হয় বলেছেন। **'অতএব ফরয নামাযের পর জামায়াত সহকারে দুআ কোন নতুন কাজ নয়!'**

কিন্তু যদি তা নতুন কাজ নাই হলো, তাহলে পুরনো কাজের সরাসরি একটি দলীলও তো থাকা দরকার। কোন এক বা দু'দিকের মিল থাকলেই তো জিনিস এক হয়ে যায় না। চিনি, লবন, ঘোল, দই ও চুন সাদা হলেও প্রত্যেকটি তো পৃথক পৃথক জিনিস। অতএব একটির স্বাদ প্রমাণ করতে আরেকটির উপর অনুমিতি কাজে লাগবে কি?

পরিশেষে আব্দুল হাকিম সাহেব তাঁর বইয়ের ৩৯ পৃষ্ঠায় বলেছেন, **'জানা গেল যে, নাবী (সাঃ) ও সাহাবিদের (রাঃ) কাওলী ও ফেয়েলী (কথা ও কাজ) উভয় প্রকার হাদীস (অনুরূপ কুরআনের বহু আয়াত) দ্বারা প্রমাণিত হল যে, ফরয এবং ওয়াজিব আকিদা না রেখে ফরয নামাযের পর ধারাবাহিকভাবে দুই হাত তুলে দুআ করা মোস্তাহাব ও জায়েয।'**

বাস! গোটা বই পড়ে যা প্রমাণ হল, তা জায়েয বাস!

এত খড়-কাঠ পুড়িয়ে শেষে আলুপোড়া।

এত বিদ্যুতের চমকানি ও এত তর্জন-গর্জনের পর শিশিরের মত এক বিন্দু বর্ষণ বাস?

এ যেন পর্বতের মুষিক প্রসব!

কেন এত কিছুর পর তা ফরয নয়, ওয়াজেবও নয়? আল্লাহর আদেশ, রসূলের আদেশ, রসূলের ফেয়েল, সাহাবাদের ফেয়েল থাকা সত্ত্বেও তা কেবল জায়েয বাস?

যে দুআ না হলে নামায (তাতে যা বলা হয়েছে) 'খিদাজ' গাবড় যাওয়ার মত হয়। 'দোয়া ত্যাগকারীকে শাস্তি দেওয়া হয়।' দুআ না করলে লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নাম যেতে হবে। দুআ না করলে বিদআতী, বিপথগামী এবং মুসলীম সমাজকে বিভ্রান্তকারী হতে হয়। দুআ না করার কারণে আল্লাহর গযবের হুমকী প্রযোজ্য হয়। দুআ না করলে আল্লাহ রাগান্বিত হন। আর সেই দুআ কেবল '**মোস্তাহাব**' ও '**জায়েয**' বাস!

সম্মানিত পাঠক! আপনি যদি এখনও এ ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে থাকেন, আপনার মন যদি এ বিতর্কিত (যা আসলে বিতর্কিত নয়) বিষয়কে বুঝে উঠতে না পারে, তাহলে সহজ করে এতটুক বুঝে নিন যে, এপার-ওপার বাংলার আলিমদের মধ্যে আমাদের নেতৃস্থানীয় উলামাগণের মতে ফরয স্বলাতের পর মুনাজাত বিদআত, যেমন সউদী আরবের সকল মুফতী তথা আল্লামা আলবানীর মতে তা বিদআত। এবারে দুই দলের মধ্যে আপনার ন্যায়পরায়ণ মনের নিক্তিতে যাঁদেরকে বেশী জ্ঞানী ও যাঁদের কথাকে অধিক বলিষ্ঠ মনে হয়, সেটির উপর আমল করুন, নাজাত পেয়ে যাবেন। আর এ কথাও জেনেছেন যে, ফরয স্বলাতের পর মুনাজাত বিদআত বলে আর কোন মুনাজাত বা দুআই নেই -তা নয়। বরং সঠিক ও সুন্নতী জায়গা তথা আম জায়গাতে আল্লাহর কাছে দুআ ও মুনাজাত করুন।

আপনি বুঝতেই পারছেন যে, ওঁদের মতে দুআ **'মোস্তাহাব'**; অর্থাৎ, যা করা

ভালো, না করলে পাপ নেই। অথবা জায়েয; যা করা, না করা সমান। অর্থাৎ, ফরয স্বলাতের পর মুনাজাত ত্যাগ করলে ওঁদের মতে কোন পাপ হচ্ছে না। *(আব্দুল হাকিম সাহেবের মত মাঝহারুল ইসলাম সাহেবও তাঁর বইয়ের ৫৯ পৃষ্ঠায় ২৬নং প্রশ্নের জবাবে উক্ত কথাই লিখেছেন।)*

পক্ষান্তরে এঁদের মতে ফরয স্বলাতের পর মুনাজাত যদি করেন, তাহলে তা বিদআত। অর্থাৎ, যা করলে শরীয়তের খিলাপ হতে পারে এবং তাতে পাপ হতে পারে। সুতরাং আপনি কোন্‌টি মানবেন, সেটা আপনার ব্যাপার।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "তুমি তোমার হৃদয়ের নিকট ফতোয়া চাও, যদিও অনেক মুফতী তোমাকে ফতোয়া দিয়ে থাকে।" *(সহীহুল জামে' ৯৪৮-নং)*

আর মহান আল্লাহ বলেন,

{فَبَشِّرْ عِبَادِ، الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ} (١٧–١٨) سورة الزمر

অর্থাৎ, সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে - যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং যা উত্তম তার অনুসরণ করে। ওরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং ওরাই বুদ্ধিমান। *(সূরা যুমার ১৭-১৮)*

ফরয স্বলাতের পর দুআর ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ আলিমগণের ফাত্‌ওয়া

সঊদী আরবের খ্যাতনামা ফক্বীহ ও দ্বিতীয় মুফতী শায়খ ইবনে উষাইমীন বলেন,

ولا شك أن الدعاء من العبادة وأنه مشروع كل وقت لكن يجب أن يعرف الفرق بين العموم والخصوص، فتقييد العام بشيء معين من زمان، أو مكان، أو حال، أو عمل يحتاج إلى دليل، فإذا قلنا يسن الدعاء بعد الصلاة؛ لأن الدعاء مشروع كل وقت، قلنا: يحتاج في تقييده بعد الصلاة إلى دليل.

ولو قال قائل: يسن للآكل إذا فرغ من أكله أن يصلي على النبي ﷺ لأن الصلاة عليه مشروعة كل وقت، قلنا: هذا يحتاج إلى دليل.

ولو قال قائل: يسن لمن فرغ من قضاء حاجته أن يذكر الله تعالى بالتهليل، والتسبيح؛ لأنه مشروع كل وقت. قلنا: تقييده بذلك يحتاج إلى دليل، وهلم جرا. فافهم هذه القاعدة فإنها مفيدة جداً.

অর্থাৎ, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, দুআ অন্যতম ইবাদত; যা সব সময়কার জন্য বিধিবদ্ধ। কিন্তু আম-খাসের মাঝে পার্থক্য বুঝা জরুরী। সুতরাং আম ইবাদতকে নির্দিষ্ট কোন কাল, স্থান, অবস্থা অথবা আমল দ্বারা খাস করার দলীল প্রয়োজন। যদি বলি, স্বলাতের পর দুআ সুন্নত; যেহেতু দুআ সকল সময়ে বিধেয়। বলব যে, স্বলাতের পর (সময়ের) সাথে দুআকে খাস করার দলীল দরকার।

যদি কেউ বলে, খাওয়ার পর আল্লাহর নবী ﷺ-এর উপর দরূদ পড়া সুন্নত। কেননা, তাঁর উপর দরূদ পড়া সকল সময়ে বিধেয়। তাহলে আমরা বলব, এর জন্য দলীল দরকার।

যদি কেউ বলে, পায়খানা-পেশাব করার পর তসবীহ-তাহলীল দ্বারা মহান আল্লাহর যিক্‌র করা সুন্নত। কেননা, যিক্‌র সকল সময়ে বিধেয়। তাহলে আমরা বলব, এই নির্দিষ্টীকরণের জন্য দলীল প্রয়োজন। অনুরূপ আরো বহু ইবাদতের ব্যাপারে এই কথাই প্রযোজ্য। এই নীতি বুঝে নিন, যেহেতু এটি বড় উপকারী। *(আল-ফিক্বহ ৭/২০৭)*

এবার বলবেন, আমাদের কাছে আমাদের দাবীর দলীল আছে। তা না থাকলে অমুক জাঁদরেল আলিম তা করবেন কেন? করে যাবেন কেন?

কারণ, হতে পারে সে প্রমাণ সহীহ নয়। অথবা যাঁকে আপনি 'জাঁদরেল' ভাবছেন তিনি আসলেই তা নন। তাছাড়া তাঁর থেকেও বড় জাঁদরেল যদি তা না করেন, তাহলে আপনি কি বলবেন?

যদি বলেন, বাংলার অমুক অমুক বাঘা আলিম, তাঁরা কি তাহলে কুরআন-হাদীস বুঝেন না?

তাহলে আমরা বলব, আরবের অমুক অমুক বাঘা আলিম, তাঁরা কি তাহলে কুরআন-হাদীস বুঝেন না? নাকি তাঁরা আরবীই বুঝেন না?

যাঁরা ফরয স্বলাতের পর নিয়মিত মুনাজাত করে গেছেন তাদের কি হবে? **'তাহলে তাঁরা কি জাহান্নামে যাবেন ইব্রাহীমের পিতা আযরের মত?'**

না, এর জন্য অবশ্যই নয়। কারণ, ইব্রাহীমের পিতা মুশরিক ছিলেন, আর তাঁরা তা ছিলেন না। তাঁরা না জেনে ভুল করে গেছেন অথবা সুন্নত মনে তা করে গেছেন, তাতে তাঁরা গোনাহগার তো হবেনই না; বরং একটি নেকীরও অধিকারী হতে পারেন।

আমাদের দেশে যেখানে গণ্য-মান্য-জঘন্য সব ধরনের আলিম জানা-অজানা

সর্বাবস্থায় মুড়ি-মুড়কির মত ফাত্‌ওয়া বিতরণে দরিয়া-দিল প্রমাণিত হয়েছেন, সেখানে সঊদী আরবের অধিবাসীবৃন্দ এ বিষয়ে বড় সতর্ক। সেখানে মুফতীগণের স্থায়ী কমিটি আছে এবং তার প্রধান মুফতী আছেন। ফরয স্বাতের পর দুআর ব্যাপারে সেই কমিটির ফাত্‌ওয়া নিম্নরূপ ঃ-

السؤال الأول من الفتوى رقم (٣٩٠١)

س١ : هل الدعاء بعد صلاة الفرض سنة وهل الدعاء مقرون برفع اليدين وهل ترفع مع الإمام أفضل أم لا ؟

ج١ : ليس الدعاء بعدالفرائض بسنة إذا كان ذلك برفع الأيدي سواء كان من الإمام وحده أو المأموم وحده أو منهما جميعا، بل ذلك بدعة؛ لأنه لم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، أما الدعاء بدون ذلك فلابأس به لورود بعض الأحاديث في ذلك .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبدالله بن قعود (عضو)، عبدالله بن غديان (عضو)، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)

৩৯০১নং ফতোয়ার প্রথম প্রশ্ন।

প্রশ্ন নং ১। ফরয স্বলাতের পর দুআ কি সুন্নত? এই দুআ কি দুই হাত তুলে করতে হবে? ইমামের সাথে হাত তুলা উত্তম কি না?

উত্তর নং ১। ফরয স্বলাতসমূহের পর দুআ সুন্নত নয়; যদি তা হাত তুলে হয়। তাতে তা ইমাম একাকী হোক, অথবা মুক্তাদী একাকী হোক অথবা ইমাম-মুক্তাদী মিলে হোক। বরং এটি বিদআত। যেহেতু (এই আমল) নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবা ﷺ থেকে বর্ণিত হয়নি। পক্ষান্তরে হাত না তুলে দুআ (যিক্‌র) করায় কোন ক্ষতি নেই। যেহেতু এ ব্যাপারে কিছু হাদীস এসেছে। আর আল্লাহই তওফীকদাতা---।

ইলমী তথ্যানুসন্ধান ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, আব্দুল্লাহ বিন কুঊদ (সদস্য), আব্দুল্লাহ বিন গুদাইয়ান (সদস্য), আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (প্রধান)

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٥٥٦٥)

س٤ : رفع اليدين بالدعاء بعد الصلوات الخمس هل ثبت رفعها من النبي ﷺ أم لا وإذا لم يثبت هل يجوز رفعهما بعد الصلوات الخمس أم لا؟

ج٤ : لم يثبت عن النبي ﷺ فيما نعلم أنه رفع يديه بعد السلام من الفريضة في الدعاء، ورفعهما بعد السلام من صلاة الفريضة مخالف للسنة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود (عضو) عبد الله بن غديان (عضو) عبد الرزاق عفيفي (نائب الرئيس) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

৫৫৬৫নং ফতোয়ায় পাঁচ ওয়াক্ত স্বলাতের পর হাত তুলে দুআকে সুন্নত-পরিপন্থী বলা হয়েছে। *(ফাতাওয়াল লাজনাহ ৯/১১৫)*

الفتوى رقم (٥٧٦٣)

س: نرى في بعض المساجد أن الإمام إذا فرغ من صلاته المفروضة يرفع يديه بالدعاء ويقتدي به المأمومون في هذا، هل ورد في هذا شيء من الكتاب والسنة، وما حكم من زعم أن ذلك واجب لابد منه أرجو إفادتي؟

ج: لا نعلم أصلا شرعيا يدل على مشروعية ما ذكرته في السؤال من أن الإمام إذا فرغ من صلاته المفروضة يرفع يديه بالدعاء ويقتدي به المأمومون في هذا، وقد ثبت عن الرسول ﷺ أنه قال «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد» وفي رواية «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود (عضو) عبد الله بن غديان (عضو) عبد الرزاق عفيفي (نائب الرئيس) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء – (ج ٩ / ص ١١٤)

ফতোয়া নং ৫৭৬৩।

প্রশ্ন ঃ কিছু মসজিদে দেখতে পাই, ইমাম ফরয স্বলাত শেষ করলে দুই হাত তুলে দুআ করেন এবং মুক্তাদীরা তাতে তার অনুসরণ করে। এ ব্যাপারে কি কিতাব ও

সুন্নাহতে কোন বিধান এসেছে? আর সেই ব্যক্তি সম্পর্কে বিধান কি, যে মনে করে অনুরূপ দুআ (মুনাজাত) ওয়াজেব ও জরুরী? আশা করি উত্তর দিয়ে উপকৃত করবেন।

উত্তর ঃ প্রশ্নে যে আমলের উল্লেখ আপনি করেছেন, অর্থাৎ ইমাম ফরয স্বলাত শেষ করলে হাত তুলে দুআ করেন এবং মুক্তাদীরা তার অনুসরণ করে, এর বৈধতার ভিত্তি শরীয়তে আছে বলে জানি না। আর নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত আছে যে, "যে ব্যক্তি আমাদের এ (দ্বীন) ব্যাপারে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে যা তার পর্যায়ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৪০নং)* "যে ব্যক্তি এমন আমল করে, যাতে আমাদের কোন নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।" *(মুসলিম ১৭১৮-নং)*

আর আল্লাহই তওফীকদাতা---।

ইলমী তথ্যানুসন্ধান ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, আব্দুল্লাহ বিন কুঊদ (সদস্য), আব্দুল্লাহ বিন গুদাইয়ান (সদস্য), আব্দুর রায্যাক আফীফী (উপপ্রধান), আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (প্রধান)।

আল্লামা শায়খ ইবনে উষাইমীন বলেন,

الدعاء بعد الفريضة ليس بسنة، ولا ينبغي فعله، إلا ما ورد عن النبي ﷺ مثل: الاستغفار ثلاثاً بعد السلام، والذي ينبغي للإنسان المصلي أن يدعو وهو في صلاته، إما في السجود لقول النبي ﷺ وعلى آله وسلم: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد"، ولقوله: "وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم"، أي حريّ أن يستجاب لك.

وأما في آخر التشهد قبل السلام لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين ذكر التشهد قال: "ثم ليتخير من الدعاء ما شاء"، وأمر المصلي إذا تشهد التشهد الأخير "أن يتعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال".

ولم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع يديه بالدعاء بعد كل فريضة حتى الاستغفار ثلاثاً ولم ينقل عنه أنه كان يرفع يديه فيه.

وليس هناك دعاء يسمى دعاء ختم الصلاة بل المأمور به بعد الصلاة ذكر الله، قال الله تعالى: (فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ).

وتوجيهي لمن يدعو الله تعالى عقب كل فريضة رافعاً يديه أن يترك ذلك اتباعاً لسنة رسول

الله ﷺ وتمسكاً بهديه، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها. الفقه لابن عثيمين رحمه الله – (ج ٧ / ص ٢٠٨)

ফরয স্বলাতের পর দুআ সুন্নত নয়। তা করাও উচিত নয়। অবশ্য যে দুআ করার ব্যাপারে নবী ﷺ থেকে হাদীস এসেছে (তা করা বিধেয়)। যেমন, সালাম ফিরার পর ৩ বার ইস্তিগফার ইত্যাদি। স্বলাত আদায়কারীর উচিত, স্বলাতের ভিতর দুআ করা। হয় সিজদাতে, যেমন নবী ﷺ বলেন, "বান্দা যখন সিজদায় থাকে, তখন সে আল্লাহর সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী হয়।" তিনি আরো বলেন, "সিজদায় তোমরা বেশী বেশী দুআ কর। কারণ তা কবুলযোগ্য।"

না হয় তাশাহহুদের শেষে সালাম ফিরার আগে দুআ করা উচিত। যেহেতু নবী ﷺ তাশাহহুদ পড়ার কথা উল্লেখ করে বলেন, "তারপর ইচ্ছামত দুআ করবে।" তিনি স্বলাত আদায়কারীকে শেষ তাশাহহুদে বসে জাহান্নামের আযাব, কবরের আযাব, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা এবং দাজ্জালের ফিতনা থেকে পানাহ চাইতে আদেশ করেছেন। আর নবী ﷺ নিজে প্রত্যেক স্বলাতের পর দুআর জন্য হাত তুলতেন না। এমনকি তিনবার ইস্তিগফারেও হাত তুলতেন বলে কোন বর্ণনা নেই।

'খাতমুস স্বালাহ' বলে কোন দুআ নেই। বরং স্বলাতের পর বাঞ্ছিত হল আল্লাহর যিক্র। মহান আল্লাহ বলেন,

(فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ).

তারপর যখন তোমরা স্বলাত শেষ করবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ কর। *(সূরা নিসা ১০৩ আয়াত)*

যে ব্যক্তি প্রত্যেক স্বলাতের পর হাত তুলে আল্লাহর কাছে দুআ করে, তার প্রতি আমার উপদেশ এই যে, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সুন্নাহর অনুসরণ করে এবং তাঁর আদর্শ অবলম্বন করে সে যেন এ আমল ত্যাগ করে। যেহেতু মুহাম্মাদ ﷺ-এর আদর্শই উত্তম আদর্শ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ যা অভিনব। *(আল-ফিক্বহ ৭/২০৮)*

মুহাদ্দিস আল্লামা আলবানী বলেন,

وجملة القول: إنه لم يثبت عن النبي ﷺ أنه كان يرفع يديه بعد الصلاة إذا دعا، وأما دعاء الإمام وتأمين المصلين عليه بعد الصلاة ـ كما هو المعتاد اليوم في كثير من البلاد الإسلامية ـ فبدعة لا أصل لها كما شرح ذلك الإمام الشاطبي في "الاعتصام" شرحاً مفيداً جداً لا أعرف له نظيراً، فليراجع من شاء البسط والتفصيل.

মোটের উপর কথা এই যে, নবী ﷺ কর্তৃক এ প্রমাণিত নয় যে, তিনি স্বলাতের পর যখন দুআ করতেন, তখন হাত তুলতেন। পক্ষান্তরে বাদ স্বলাত ইমামের দুআ করা ও তার উপর মুক্তাদীদের 'আমীন-আমীন' বলা -যেমন বর্তমানে বহু ইসলামী দেশে প্রচলিত -তা বিদআত; তার কোন ভিত্তি নেই। যেমন এ বিষয়টিকে ইমাম শাত্বেবী তাঁর 'আল-ই'তিস্বাম' নামক গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, যা অত্যন্ত উপকারী, যার কোন নযীর আমার জানা নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি বিস্তারিত জানতে চায়, সে ঐ গ্রন্থের প্রতি রুজু করুক। *(সিলসিলাহ যয়ীফাহ ২৫৪৪নং)*

উল্লেখিত ব্যক্তি মহোদয়গণ কি করে বলার সাহস করেন যে, কোন প্রমাণ নেই? তাহলে এঁরা কি বুখারী শরীফের ৪৫টি ও মুসলিম শরীফের ৩৫টি শারাহ দেখেননি বা পড়েননি? (সালাতে হাকিম ঃ দোয়ায়ে হাকিম ভূমিকা দ্রঃ) তাঁরা তিরমিযীর শারাহ 'কুউওয়াতুল মুগতাযী' (?!) (সঠিক নাম ঃ কূতুল মুগতাযী), 'তোহফাতুল আহবুযী' (?!) (সঠিক নাম ঃ তুহফাতুল আহওয়াযী) এবং 'আলকাওয়াকিবুদ দুরীয়ো' (?!) (সঠিক নাম ঃ আল-কাওয়াকিবুদ দারারিয়্য) ইত্যাদি চোখ খোলা ও মন গলানোর কিতাব ওঁরা পড়েছেন আর এঁরা কি পড়েননি?

বইয়ের নামসমূহ সঠিকভাবে যাঁর আয়ত্তে নেই, তিনি কিভাবে এমন আস্ফালন করেন, তা আল্লাহই ভালো জানেন। তাছাড়া পূর্ণ বইয়ে আরাবী শব্দসমূহের উচ্চারণে অসংখ্য ভুল, তা আরাবী শিক্ষিতগণ অবশ্যই দেখতে পারেন।

বড় অবাক লাগে তাঁর এই মন্তব্যে, **'কম্বলের রোঁয়া বাছতে সব শেষ।' 'তাহলে সাজদা রুকু কোয়ুদ, তাশাহহোদ, দোয়ার ধরণের মতো পাঠাবে নাকি? বিজ্ঞান যেমন অনেক আবিষ্কারে পাল্টিয়েছে। এই ভাবে শারিয়াতের আমল অনেক বাদ অবশ্য পড়েছে। বাদ দিতে দিতে কম্বলের লোমের মতো বাছতে বাছতে সব বাদ পড়ে যাবে নাকি? এরা মনে হয়, নামাজ রোযাও রাখবে না। দেখি কত দূর গড়ায়!!!!'**

এ উক্তি কোন আলিম করতে পারেন? উনার ধারণামতে শরীয়তের সবকিছুই কম্বলের রোঁয়া। অর্থাৎ ফরয, সুন্নত, নফল, বিদআত সবই সমান! অথচ প্রকৃতপক্ষে বিদআত উচ্ছেদ কম্বলের রোঁয়া বাছা নয়; বরং ফুল বাগানের আগাছা অথবা ধানক্ষেতের ঝোড়া বাছা।

শরীয়ত জ্ঞান করে যে সকল আমল শরীয়তে অনুপ্রবেশ করেছিল এবং অসাবধানতায় আমাদের দেশের হুযুররা আমল শুরু করে দিয়েছেন, তা বাদ দিলে তাঁরা মনে করেন সুন্নত বা ফরয বা দ্বীনের মৌলিক অংশ বাদ চলে গেল। তাঁরা মনে করেন, তাঁরা যেটা করেন, তা ভুল হতে পারে না। তাই কোন সত্যানুসন্ধানী আলিম তাঁদের ভুল ধরলে ইয্যতে লাগে, সম্মান ও গদির মায়া ছাড়তে বড় মায়া লাগে।

'সোনা বলে জ্ঞান ছিল, কষিতে পিতল হল' তা সত্ত্বেও তাঁরা পিতলকেই সোনা বলে চালাতে চান। দ্বীনে অনুপ্রবিষ্ট 'বিদআত' ত্যাগ করতে বললে তাঁরা মনে করেন, দ্বীনই ত্যাগ করতে বলা হচ্ছে হয়তো!

প্রসঙ্গতঃ ইবনে মাসউদ ﷺ-এর একটি উক্তি মনে আসে, তিনি বলেছেন, 'তোমাদের তখন কি অবস্থা হবে, যখন ফিতনা তোমাদেরকে আচ্ছাদিত করে নেবে? যাতে বড় বৃদ্ধ হবে এবং ছোট প্রতিপালিত (হয়ে বড়) হবে। মানুষ যাকে সুন্নাহ জ্ঞান করবে। যখন তা (ফিতনা বা বিদআত) অপসারিত করা হবে তখন লোকেরা বলবে, 'সুন্নাত অপসারিত হল।' একজন জিজ্ঞাসা করল, 'হে আবু আব্দুর রহমান! এরূপ কখন হবে?' তিনি বললেন, 'যখন তোমাদের ক্বারীর সংখ্যা অধিক হবে এবং ফকীহ (অভিজ্ঞ আলিমদের) সংখ্যা কম হবে, তোমাদের নেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং আমানতদারের সংখ্যা কমে যাবে ও আখেরাতের কর্ম দ্বারা দুনিয়ার সম্পদ অন্বেষণ করা হবে।'' *(দারেমী ১/৬৪ নং)*

তাঁর মতই আরো অনেকে বলেন, 'পায়জামা খাটাতে খাটাতে শেষকালে দেখছি আণ্ডারপ্যান্ট্ হয়ে যাবে!'

অর্থাৎ ফরয নামাযের পর হাত তুলে দুআ উঠে গেলে যেন দ্বীনের মূল অংশ বাদ পড়ে গেল! এঁদের নিকটে মুড়ি-মুড়কির সমান দর। কাক-কোকিলের কোন পার্থক্য নেই। অথচ ইসলামে অতিরঞ্জনের স্থান নেই। ইসলামে কোন কিছু এমন নেই যাতে সংযোজন করা যাবে অথবা কিছু হ্রাস করা যাবে। বাড়তি নখ-চুল কাটা অবশ্যই বাঞ্ছিত, আঙ্গুল বা মাথা কাটা নয়। পায়জামা গাঁটের নিচে ঝুলে রাস্তার ময়লা লাগলে অবশ্যই জ্ঞানীগণ তা কেটে গাঁটের উপর পর্যন্ত করে নেন। কারণ তাঁরা জানেন যে, গাঁটের নিচে কাপড় পরা হারাম। সুতরাং অপ্রয়োজনীয় বাড়তি অংশ কাটা তো সকলের নিকট জ্ঞান ও বিজ্ঞান-সম্মত। আর বাড়তি অংশ কাটলেই যে আসল অংশও কাটা যাবে তা জরুরী নয়। অবশ্য যাঁদের নিকটে আসল-নকলের কোন পার্থক্য-জ্ঞান নেই তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

জামিআহ সালাফিয়্যাহ বানারস (আল্লাহ প্রতিষ্ঠানটিকে দীর্ঘকাল যাবৎ টিকিয়ে রাখুক) এর যোগ্যতম উস্তায ও আমার তিরমিযী ও অন্যান্য বইয়ের শিক্ষক জনাব শায়খ আযীযুর রহমান সালাফী (মাত্তাআনাল্লাহু বিতূলি হায়াতিহী) এই বিতর্ককে কেন্দ্র করে একটি বই লিখেছেন; যার নাম ঃ দুআকে আদাব ও আহকাম। তিনি তাতে পক্ষে-বিপক্ষের দলীলসমূহকে পর্যলোচনার পর ১৩৫-১৩৭ পৃষ্ঠাতে যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তার কিছু নিম্নরূপ ঃ-

(৩) নামাযের ভিতরে ও বাহিরে দুআ করা প্রমাণিত।

(৫) নামাযের পরে হাত উঠিয়ে দুআ করা প্রমাণিত নয়।

(৬) মুক্তাদিগণের সাথে ইমামের দুআ করাটা রাসূলুল্লাহর নীতি ছিল না। এমন করাটা তাঁর নিকট হতে প্রমাণিত নয়।

(৭) যে সমস্ত বর্ণনা দ্বারা ফরয নামায শেষে হাত উঠিয়ে দুআ করা 'মুস্তাহাব' বলে পেশ করা হয়ে থাকে, তা সবটাই যয়ীফ।

(১২) দুআর পরে মুখে হাত বুলানোর হাদীস সহীহ নয়।

(১৩) যে কোন ইবাদতের জন্য শরীয়তের পক্ষ থেকে দলীল থাকা আবশ্যক।

(১৬) যয়ীফ হাদীসের দ্বারা কোন বিষয়ের মুস্তাহাব হওয়াটা ঠিক নয়। কেননা, এটাও শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত (আর তা প্রমাণে সঠিক দলীলের দরকার)।

প্রচলিত এই দুআর কুফল

শায়খ আবুল কাসিম জঙ্গীপুরী 'দুআ করুন ও বিদআত হতে বাঁচুন' বইয়ের ২য় খন্ডের শেষ পাতায় এ প্রসঙ্গে যে কথাগুলি লিখেছেন, তা হুবহু আমি এখানে নকল করে দিলাম। আশা করি সুন্নাত-প্রিয় মুসল্লীগণ এর দ্বারা লাভবান হবেন।

১। প্রথম কথা নবী ﷺ-এর এই পদ্ধতিতে ফরয নামায পর কখনই দুআ করেননি বা কাউকে করতেও বলেননি। কাজেই নিঃসন্দেহে ইহা বিদআত। আর এই বিদআত যে কত সাংঘাতিক কাজ, বইয়ের প্রথম খণ্ডে আমি তা আলোচনা করেছি।

২। এই দুআ চালু হওয়ার ফলে দুআর আসল (প্রকৃত) স্থানে, অর্থাৎ নামাযের অভ্যন্তরে মুসল্লীদের আজিযী-ইনকেসারী করা একদম হারিয়ে গেছে। প্রচলিত এই দুআতে যত মনোনিবেশ করা হয়, তার এক পয়সা পরিমাণও নামাযের মধ্যে মনোনিবেশ করা হয় না।

৩। এই দুআ চালু হওয়ার ফলে সালাম ফেরার পর যে সব সুন্নাতী যিক্র-আযকার আছে, অধিকাংশ মুসল্লী তা শিখার দরকার মনে করে না। খাজেই অধিকাংশ মুসল্লীর কাছ থেকে সুন্নতী যিক্র-আযকার ও দুআ হারিয়ে গেছে।

৪। মুখে আমরা যাই বলি না কেন? বর্তমানে প্রচলিত এই পদ্ধতি প্রায় ফরযে পরিণত হয়েছে। কোন মুসল্লী যদি ইমামের সঙ্গে এই দুআতে হাত না তুলে সুন্নাতী যিক্র-আযকারে লিপ্ত থাকেন, তবে তাঁর আর রক্ষা থাকে না। কোন মুসল্লী যদি এতে শরীক না হয়ে উঠে চলে যান, তাহলে অনেকেই তার উপর চোখ গরম করেন। যতক্ষণ এই পদ্ধতিতে ইমাম সাহেব দুআ করতে থাকবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন মুসল্লী উঠে চলে যেতে পারবেন না। থাহলে এটা ফরয নয় তো আর কি?

৫। নবী ﷺ যেখানে মুসল্লীদের উপর নরমী করলেন, সেখানে এই দুআ চালু করে মুসল্লীদেরকে আমরা মুশকিলে ফেলে দিলাম। ইমামের হাত তুলে দুআ শেষ না করা পর্যন্ত যদি তাঁরা উঠে যেতে না পান, তবে তাঁদের উপর এটা মুসীবত ছাড়া আবার কি?

৬। এই পদ্ধতিতে দুআ সমস্ত মুক্তাদীকে শামিল করতে অপারগ। যেমন কোন মুক্তাদী শেষে এসে জামাআত ধরলেন। ইমাম সাহেব সালাম ফিরিয়ে পূর্ণ মুক্তাদীদের নিয়ে হাত তুলে দুআ করতে লাগলেন এবং পূর্ণ মুক্তাদীরাও তাঁর সাথে 'আমীন আমীন' বলতে লাগলেন। কিন্তু বেচারা মসবূক মুসল্লীরা (যাঁরা পরে এসে জামাআত ধরেছেন, তাঁরা এই দুআ হতে বঞ্চিত থেকে গেলেন। কেননা, তখন তাঁরা তাঁদের ছুটে যাওয়া নামায পড়তে ব্যস্ত। প্রচলিত এই দুআতে লাভ তো তাঁদের কিছুই হয় না; বরং ইমামের জোরে জোরে দুআ করাতে এবং মুক্তাদীদের সমবেত কণ্ঠে জোরে জোরে 'আমীন-আমীন' বলাতে তাঁদের মনোযোগ নষ্ট হয়ে যায় এবং নানা প্রকার ভুল-ভ্রান্তি হতে থাকে। সহীহ হাদীসের খেলাপ আমল করারই এটা কুফল। নবী ﷺ-এর শিখানো মুতাবিক আমরা যদি শেষ বৈঠকেই সালাম ফেরার আগে একটু বেশী করে দুআ করার অভ্যাস করতাম, তবে সব রকমের মুক্তাদীই ইমাম সাহেবের দুআতে শামিল হতে পারতেন।

ফাযায়েলে আ'মালে যয়ীফ হাদীসের ব্যবহার

'প্রশ্নোত্তরে ফরয নামাযের পর দোওয়া' বইয়ের একাধিক স্থানে; যেমন ৬০ পৃষ্ঠাতে ও 'সালাতে হাকিম ঃ দোয়ায়ে হাকিম' বইয়ের ৯ পৃষ্ঠাতে ফাতাওয়া সানাইয়্যার ১ম খণ্ড ৫০৭ পৃষ্ঠার বরাতে একটি আরাবী ইবারত নকল করা হয়েছে; যা দেখে আরাবীর অনভিজ্ঞ মানুষ ভাবতে পারেন যে, মনে হয় ওটা কোন হাদীস অথবা শরীআতী বিধান।

قال في فتح القدير في الجنائز: والاستحباب يثبت بالضعيف غير الموضوع.

অর্থাৎ, জাল হাদীস ছাড়া যয়ীফ হাদীস দ্বারা কোন আমল মুস্তাহাব হওয়া প্রমাণিত হতে পারে।

আব্দুল হাকিম সাহেব আরও লিখেছেন, **'ফাযায়েলে আমালিয়াতে, হাদিস, যা মৌযু নয়, যায়িফ দ্বারা, পছন্দনীয় সাব্যস্ত হয়।'**

(১) এই উক্তি হতে অনেকেই 'সাধারণ' বা 'ব্যাপক' অর্থ বুঝে থাকেন। মনে করেন

যে, উক্ত আমলে উলামাদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই। অথচ এ রকমটা নয় বরং তাতে বিদিত মতভেদ বর্তমান যা বিভিন্ন হাদীসের পারিভাষিক (অসূলে হাদীসের) গ্রন্থসমূহে বিশদভাবে আলোচিত। যেমন আল্লামা শায়খ জামালুদ্দীন কাসেমী (রঃ) তার গ্রন্থ (কাওয়ায়েদুল হাদীসে) আলোচনা করেছেন।

তিনি ১১৩ পৃষ্ঠায় ইমামগণের এক জামাআত থেকে নকল করেন যে, তাঁরা আদপে যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমল করা ঠিক মনে করতেন না। যেমন, ইবনে মাঈন, বুখারী, মুসলিম, আবু বাকর ইবনুল আরাবী প্রভৃতিগণ। এঁদের মধ্যে ইবনে হায্‌ম অন্যতম; তিনি তার গ্রন্থ 'আল-মিলাল অন্‌-নিহাল' এ বলেন, '(সেই হাদীস দ্বারা আমল সিদ্ধ হবে) যে হাদীসকে পূর্ব ও পশ্চিমের লোকেরা (অর্থাৎ, বহু সংখ্যক লোক) কিংবা সকলেই সকল হতে কিংবা বিশ্বস্ত বিশ্বস্ত হতে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছে। কিন্তু যে হাদীসের বর্ণনা-সূত্রে কোন মিথ্যায় অভিযুক্ত ব্যক্তি, কিংবা কোন অমনোযোগী গাফেল ব্যক্তি কিংবা কোন পরিচয়হীন অজ্ঞাত ব্যক্তি থাকে, তাহলে সেই হাদীস (যয়ীফ হওয়া সত্ত্বেও তার) দ্বারা কতক মুসলিম বলে থাকে (আমল করে থাকে)। অবশ্য আমাদের নিকট এমন হাদীস দ্বারা কিছু বলা (বা আমল করা), তা সত্য জানা এবং তার কিছু অংশ গ্রহণ করাও বৈধ নয়।'

হাফেয ইবনে রজব তিরমিযীর ব্যাখ্যা-গ্রন্থে (২/১১২)তে বলেন, 'ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থের ভূমিকায় যা উল্লেখ করেছেন তার প্রকাশ্য অর্থ এই বুঝায় যে, তরগীব ও তরহীবে (অনুপ্রেরণাদায়ক ও ভীতি সঞ্চারক)এর হাদীসও তার নিকট হতেই বর্ণনা করা হবে, যার নিকট হতে আহকাম (কর্মাকর্ম সম্পর্কিত)এর হাদীস বর্ণনা করা হয়। (অর্থাৎ যয়ীফ রাবী হতে যেমন আহকামের হাদীস বর্ণনা করা হয় না, তেমনিই সেই রাবী হতে তরগীব ও তরহীবের হাদীসও বর্ণনা করা হবে না।)

এ যুগে অদ্বিতীয় মুহাদ্দেস আল্লামা আলবানী (হাফিযাহুল্লাহ) বলেন, 'এই অভিমত ও বিশ্বাস রেখেই আমি আল্লাহর আনুগত্য করি এবং এই অভিমতের প্রতিই মানুষকে আহবান করি যে, যয়ীফ হাদীস দ্বারা আদপে আমল করা যাবে না, না ফাযায়েল ও মুস্তাহাব আমলে আর না অন্য কিছুতে। কারণ, যয়ীফ হাদীস কোন বিষয়ে অনিশ্চিত ধারণা জন্মায় মাত্র (যা নিশ্চিতরূপে রসূল ﷺ-এর বাণী নাও হতে পারে।) [১] এবং আমার জানা মতে, উলামাদের নিকট এটা অবিসংবাদিত। অতএব যদি তাই হয়,

---

(১) *অনেকে বলে থাকে যে, 'কসম করে বলতে পারবে যে, যয়ীফ হাদীস রসূলের উক্তি নয়! উত্তরে বলা যায় যে, তা বলা যাবে না ঠিক। কিন্তু কসম করে এও বলতে পারা যাবে না যে, 'যয়ীফ হাদীস তাঁর উক্তি।' সুতরাং সন্দিহান বিদ্যমান, যা ত্যাগ করাই উত্তম এবং পূর্বসতর্কতামূলক কর্ম।*

তবে কিরূপে ঐ হাদীস দ্বারা আমল করার কথা বৈধ বলা যায়? অথচ আল্লাহ অজাল্লা তাঁর কিতাবে একাধিক স্থানে 'ধারণার' নিন্দাবাদ করেছেন; তিনি বলেন,

{وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} (٢٨) سورة النجم

অর্থাৎ, ওদের এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই, ওরা অনুমানের অনুসরণ করে অথচ সত্যের বিরুদ্ধে অনুমানের (ধারণার) কোন মূল্য নেই। *(সূরা নাজ্‌ম ২৮ আয়াত)*

আর আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা অনুমান (ধারণা) করা হতে বাঁচ। অবশ্যই অনুমান সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

জেনে রাখুন যে, আমি যে রায় এখতিয়ার করেছি তার প্রতিপক্ষের নিকট এই রায়ের বিপক্ষে) কিতাব ও সুন্নাহ থেকে কোন দলীল নেই। অবশ্য পরবর্তীযুগের কোন আলিম তার গ্রন্থ 'আল-আজবিবাতুল ফাযেলাহ' তে এই মাসআলার উপর নির্দিষ্ট পরিচ্ছেদে (৩৬-৫৯পৃঃ) ওঁদের সমর্থনে (ও আমাদের এই অভিমতের বিরুদ্ধে) দলীল পেশ করার প্রচেষ্টা করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের সপক্ষে অন্ততঃপক্ষে একটিও এমন দলীল উল্লেখ করতে সক্ষম হননি, যা হুজ্জতের উপযুক্ত! হ্যাঁ, তবে কিছু এমন উক্তি তাঁদের কারো কারো নিকট হতে নকল করেছেন, যেগুলি উক্ত বিতর্ক ও সমীক্ষার বাজারে অচল। এতদ্‌সত্ত্বেও ঐ সমস্ত উক্তির কিছু কিছুতে পরস্পর-বিরোধিতাও বিদ্যমান। যেমন, ৪১ পৃষ্ঠায় ইবনুল হুমাম হতে নকল করেন, "গড়া নয় এমন যয়ীফ হাদীস দ্বারা ইস্তিহবাব প্রমাণিত হবে।" অতঃপর ৫৫-৫৬ পৃষ্ঠায় জালালুদ্দীন দাওয়ানী হতে নকল করেন, তিনি বলেছেন, এ কথা সর্বসম্মত যে, যয়ীফ হাদীস দ্বারা শরীয়তের 'আহকামে খামসাহ' (অর্থাৎ ওয়াজেব, মুস্তাহাব, মুবাহ, মকরূহ ও হারাম) প্রমাণিত হবে না এবং ওর মধ্যে ইস্তিহবাবও।

আমি (আলবানী) বলি, এ কথাটাই সঠিক! যেহেতু অনুমান দ্বারা আমল নিষিদ্ধ এবং যয়ীফ হাদীস অনিশ্চিত অনুমান বা ধারণা সৃষ্টি করে, যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে।'

মোট কথা, ফাযায়েলে আ'মাল বলতে এমন আমল যার ফযীলত আছে, তা যয়ীফ হাদীসের উপর ভিত্তি করে করা যাবে না। করলে তা বিদআত বলে গণ্য হবে। যেহেতু যয়ীফ হাদীস দ্বারা কোন আহকাম বা আমল (অনুরূপ কোন আকীদাও) সাব্যস্ত হয় না। তবে এমন আমল যা সহীহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে তার ফযীলত বর্ণনায় আমল করা যায়, তবে তারও শর্ত আছে যা পরে বলা হবে।

উদাহরণস্বরূপ, চাশ্তের স্বলাত সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। *(মুসলিম)* কিন্তু তার ফযীলত প্রসঙ্গে এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, "যে ব্যক্তি ঐ স্বলাত পড়বে তার পাপ সমূদ্রের ফেনার সমান হলেও ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" *(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি নিয়মিত বারো রাকআত চাশ্তের স্বলাত পড়ে, তার জন্য আল্লাহ পাক বেহেশ্তে এক সোনার মহল তৈরী করেন।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

আর এ দুটি হাদীসই যয়ীফ। চাশ্তের স্বলাতের এই ফযীলত বিশ্বাসে (ওঁদের মতে) তা ব্যবহার করা যায়।

অনুরূপভাবে কুরবানী করা ও তার মর্যাদা কুরআন ও সুন্নাহতে প্রমাণিত। তার ফযীলত বর্ণনায় (ওঁদের মতে কিছু শর্তের সাথে) "কুরবানীর পশুর প্রত্যেক লোমের পরিবর্তে এক একটা নেকী--।" এই হাদীস ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।

এ বিষয়ে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) বলেন, 'শরীয়তে যয়ীফ হাদীসকে ভিত্তি করা বৈধ নয়, যা সহীহ বা হাসান নয়। কিন্তু ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল প্রভৃতি উলামাগণ ফাযায়েলে আ'মালে সাবেত (প্রমাণসিদ্ধ) বলে জানা না যায় এমন হাদীস বর্ণনা করাকে জায়েয বলেছেন, যদি তা (ঐ যয়ীফ হাদীস) মিথ্যা বলে জানা না যায় তবে।

অর্থাৎ, যখন জানা যাবে যে, আমল শরয়ী (সহীহ) দলীল দ্বারা বিধেয় এবং তার ফযীলতে এমন হাদীস বর্ণিত হয় যা মিথ্যা (মওযু') বলে জানা যায় না, তাহলে (হাদীসে বর্ণিত) সওয়াব সত্য হতে পারে (এই বিশ্বাস করা যায়)। কিন্তু ইমামগণের কেউই এ কথা বলেননি যে, যয়ীফ হাদীস দ্বারা কোন কিছুকে ওয়াজেব অথবা মুস্তাহাব করা যাবে। আর যে এ কথা বলে সে ইজমা' (সর্ববাদীসম্মতি)র বিরোধিতা করে। তদনুরূপ, কোন শরয়ী (সহীহ) দলীল ছাড়া কোন কিছুকে হারাম করাও অবৈধ। কিন্তু যদি (কোন সহীহ হাদীস দ্বারা) তার হারাম হওয়ার কথা বিদিত হয় এবং ঐ কাজের কর্তার জন্য শাস্তি বা তিরস্কারের কথা কোন এমন (দুর্বল) হাদীসে বর্ণিত হয় - যা মিথ্যা বলে জানা না যায় - তবে তা (ঐ শাস্তির বিশ্বাসে) বর্ণনা করা বৈধ।

অনুরূপভাবে তরগীব ও তরহীবে ঐরূপ হাদীস বর্ণনা করা বৈধ হবে; যদি তা মিথ্যা (গড়া) বলে পরিচিত না হয়। কিন্তু এ কথা জানা জরুরী হবে যে, আল্লাহ এ বিষয়ে এই অজ্ঞাত-পরিচয় হাদীস ছাড়া অন্য কোন দ্বিতীয় (সহীহ) দলীলে তরগীব বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে ইসরাঈলিয়াতও তরগীব ও তরহীবে বর্ণনা করা যায়; যদি তা মিথ্যা

বলে বিদিত না হয় এবং যখন জানা যায় যে, ঐ বিষয়ে আল্লাহ পাক আমাদের শরীয়তে আদেশ দান করেছেন অথবা নিষেধ করেছেন। কিন্তু কেবলমাত্র অপ্রমাণিত (অশুদ্ধ) ইসরাঈলিয়াত দ্বারা আমাদের শরীয়ত প্রমাণ করা হবে -এ কথা কোন আলিম বলেন না। বরং ইমামগণ এই ধরণের কোন হাদীসকেই শরীয়তের বুনিয়াদ করেন না। আহমাদ বিন হাম্বল এবং তার মত কোন ইমামই শরীয়তে ঐ ধরনের হাদীসের উপর নির্ভর (ভিত্তি) করতেন না। যে ব্যক্তি নকল করে যে, আহমাদ যয়ীফ হাদীসকে হুজ্জত (বা দলীল) করতেন; যে হাদীস সহীহ বা হাসান নয়, তবে নিশ্চয় সে তাঁর সম্পর্কে ভুল বলে।' *(আল কায়েদাতুল জালীয়াহ ৮২ পৃঃ, মজমুআ ফাতাওয়া ১/২৫১ নং)*

আল্লামা আহমাদ শাকের 'আল-বায়েসুল হাযীষ' গ্রন্থে (১০১ পৃষ্ঠায়) বলেন, 'আহমাদ বিন হাম্বল, আব্দুর রাহমান বিন মাহদী এবং আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (রঃ) এর উক্তি, 'যখন আমরা হালাল ও হারামে (আহকামে) হাদীস বর্ণনা করি, তখন কড়াকড়ি করি এবং যখন ফাযায়েল ইত্যাদিতে বর্ণনা করি তখন শৈথিল্য করি--।'

আমার মতে -অল্লাহ আ'লাম- তাঁদের বলার উদ্দেশ্য এই যে, শৈথিল্য কেবল হাসান হাদীস গ্রহণে করতেন যা 'সহীহ' এর দর্জায় পৌঁছে না। কারণ সহীহ ও হাসানের মাঝে পার্থক্যরূপ পরিভাষা তাঁদের যুগে স্পষ্ট স্থিত ছিল না। বরং অধিকাংশ পূববর্তীগণ হাদীসকে কেবল সহীহ অথবা যয়ীফ (এই দুই প্রকার) বলেই মনে করতেন।

সুতরাং তাঁদের ঐ শৈথিল্য যয়ীফ হাদীস বর্ণনায় নয়, হাসান হাদীস বর্ণনায়।)

আল্লামা আলবানী বলেন, 'আমার নিকট এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা রয়েছে, তাদের ঐ উল্লেখিত শৈথিল্য ইসনাদ (বর্ণনা সূত্র)সহ যয়ীফ হাদীস রেওয়ায়াত করার উপর মানা যায় - যেমন তাদের বর্ণনার ধারা ও প্রকৃতি; যে ইসনাদ সমূহের মাধ্যমে হাদীসের দুর্বলতা জানা সম্ভব হয়। সুতরাং কেবলমাত্র সনদ উল্লেখ করাই যথেষ্ট হয় এবং 'যয়ীফ' বলে বিবৃত করার প্রয়োজন আর থাকে না। কিন্তু ঐ ধরণের হাদীস বিনা সনদে বর্ণনা করা -যেমন পরবর্তীকালে উলামাগণের ধারা ও প্রকৃতি এবং তার দুর্বলতা বর্ণনা না করা -যেমন ওঁদের অধিকাংশের রীতি - এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা থেকে তাঁরা (ইমাম আহমাদ প্রভৃতিগণ) বহু উর্ধ্বে এবং এ বিষয়ে তাঁরা আল্লাহকে অধিক ভয় করতেন। আর আল্লাহই অধিক জানেন।'

(২) যে ব্যক্তি এ ধরণের কোন গ্রন্থ লিখেন যাতে চোখ বুজে সহীহ-যয়ীফ সবই সংকলন করেন এবং মনে করেন যে, কিছু শর্তের সাথে যয়ীফ হাদীস দ্বারা ফাযায়েলে আ'মালে আমল করা যায় তাঁর উচিত, গ্রন্থের ভূমিকায় সে বিষয়ে (সাধারণকে) সতর্ক করা এবং ঐ শর্তাবলী উল্লেখ করে (সেই অনুযায়ী) আমল করতে সাবধান করা। যাতে

পাঠকও অজান্তে গ্রন্থে উল্লেখিত প্রত্যেক হাদীসের উপর আমল এবং মুবাল্লেগও ঐ গ্রন্থ শুনিয়ে সকলকে আমল করার তাকীদ না করে বসে। ফলে সকলের অজান্তেই সকলে রসূলের বিরোধিতায় আলিপ্ত না হয়ে পড়ে।

সুতরাং ঐ শর্তগুলিকে জানা একান্ত জরুরী; বিশেষ করে তাঁদের জন্য যাঁরা ফাযায়েলে যয়ীফকে ব্যবহার করে থাকেন। যাতে যে কেউ ধ্বংস হবে সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট জানার পর ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকবে সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট জানার পর জীবিত থাকে।

হাফেয সাখাবী 'আল-ক্বওলুল বাদী' (১৯৫ পৃঃ)তে তার ওস্তাদ হাফেয ইবনে হাজার থেকে ঐ শর্তগুলি নকল করেছেন এবং তা নিম্নরূপ ঃ-

(ক) হাদীস যেন খুব বেশী যয়ীফ না হয়। অথবা তার বর্ণনা সূত্রে যেন কোন মিথ্যাবাদী, মিথ্যায় কলঙ্কিত বা অভিযুক্ত এবং মারাত্মক ত্রুটি করে এমন ব্যক্তি না থাকে।

(খ) তা যেন (শরীয়তের) 'সাধারণ ভিত্তির' অন্তর্ভুক্ত হয়। অর্থাৎ একেবারে ভিত্তিহীন গড়া বা জাল হাদীস না হয়।

(গ) এ হাদীস দ্বারা আমল করার সময় যেন তা প্রমাণিত (বা শুদ্ধ) হাদীস বলে বিশ্বাস না রাখা হয়। যাতে নবী ﷺ-এর সাথে সেই সম্পর্ক না জোড়া হয়; যা তিনি বলেননি।

অতঃপর তিনি বলেন শেষোক্ত শর্ত দুটি ইবনে আব্দুস সালাম ও ইবনে দাক্বীক্বুল ঈদ হতে বর্ণিত এবং প্রথমোক্তের জন্য আলাঈ বলেন, 'তা সর্ববাদিসম্মত।'

ইবনে হাজার (রঃ) তাঁর পুস্তিকা 'তাবয়ীনুল আজব' এ বলেন, 'আহলে ইল্মগণ ফাযায়েলে যয়ীফ হাদীস ব্যবহার করতে অনুমতি দিয়েছেন; যদি তা গড়া না হয় বা খুব বেশী যয়ীফ না হয় -এ কথাটি প্রসিদ্ধ। কিন্তু এর সাথে এই শর্তও আরোপ করা উচিত যে, আমলকারী যেন ঐ হাদীসটিকে যয়ীফ বলেই বিশ্বাস রাখে (শুদ্ধ মনে না করে) এবং তা যেন প্রচার না করে। যাতে কেউ যেন যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমল করে যা শরীয়ত নয় তাকে শরীয়ত করে না বসে অথবা কোন জাহেল তাকে আমল করতে দেখে তা সহীহ সুন্নাত মনে না করে বসে।

এ বিষয়ে আবু মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুস সালাম প্রভৃতি উলামাগণ বিবৃতি দিয়েছেন। যাতে মানুষ আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সেই বাণীর পর্যায়ভুক্ত না হয়ে পড়ে যাতে তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি আমার তরফ থেকে কোন এমন হাদীস বর্ণনা করে যার বিষয়ে সে মনে করে যে তা মিথ্যা, তাহলে সে (বর্ণনাকারী) মিথ্যাবাদীদের একজন।" *(মুসলিম, সহীহুল জামে' ৬১৯৯নং)*

সুতরাং যে আমল করবে তার অবস্থা কি? আহকাম অথবা ফাযায়েলে (যয়ীফ) হাদীস দ্বারা আমল করায় কোন পার্থক্য নেই। (অর্থাৎ যদি যয়ীফ হাদীস দ্বারা আহকাম বা হালাল ও হারামে আমল না চলে তবে ফাযায়েলেও চলবে না।) কারণ, (উভয়ের) সবটাই শরীয়ত।'

আল্লামা আলবানী (রঃ) বলেন, 'এই সমস্ত শর্তাবলী খুবই সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ। যদি যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমলকারীরা এর অনুগামী হয়, তাহলে তার ফল এই হবে যে, যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমলের সীমা সংকীর্ণ হবে অথবা মূলেই আমল প্রতিহত হবে। এর বিবরণ তিনভাবে দেওয়া যায়ঃ-

প্রথমতঃ প্রথম শর্তটি নির্দেশ করে যে, যে হাদীসকে ভিত্তি করে আমল করার ইচ্ছা হবে সেই হাদীসটির প্রকৃত অবস্থা জানা ওয়াজেব। যাতে বেশী যয়ীফ হলে তার দ্বারা আমল করা থেকে দূরে থাকা সম্ভব হবে। কিন্তু প্রত্যেক হাদীসের উপর এই জ্ঞান লাভ জনসাধারণের পক্ষে খুবই কষ্টসাধ্য। যেহেতু হাদীসশাস্ত্রবিদ উলামার সংখ্যা নেহাতই কম, বিশেষ করে বর্তমান যুগে। অর্থাৎ, সেই উলামার সংখ্যা নগণ্য যাঁরা তথ্যানুসন্ধানকারী (সমস্ত হাদীসের সত্যাসত্য যাচাইকারী) গবেষণা ও সমীক্ষাকারী হাদীস বিশারদ, যাঁরা রসূল ﷺ হতে শুদ্ধ প্রতিপাদিত হাদীস ব্যতীত লোকদের জন্য অন্য কোন হাদীস পরিবেশন ও বর্ণনা করেন না এবং যয়ীফ (তথা তার নিম্নমানের) হাদীসের উপর সকলকে সতর্ক ও সাবধান করে থাকেন। বরং এই গ্রুপের উলামা অল্পের চেয়ে কম। সুতরাং আল্লাহই সাহায্যস্থল।

এরই কারণে দেখবেন, যারা হাদীস দ্বারা আমলে আপদগ্রস্ত হয়েছে তারা এই শর্তের স্পষ্ট বিরোধিতা করে। তাদের কেউ যদিও বা সে অহাদীসের আলিম হয় -ফাযায়েলে আ'মালে কোন হাদীস জানা মাত্রই তা অধিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত কিনা তা না জেনেই তার উপর আমল করায় ত্বরান্বিত হয়। এরপর যদি কেউ তাকে ঐ হাদীসের দুর্বলতার উপর সতর্ক করে, তবে শীঘ্র ঐ তথাকথিত 'কায়দার' শরণাপন্ন হয়; "ফাযায়েলে আ'মালে যয়ীফ হাদীস ব্যবহার করা যায়।" পুনশ্চ যখন এই শর্তের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, তখন উত্তর না দিয়ে চুপ থেকে যায়।'

এ বিষয়ে আল্লামা দুটি উদাহরণ পেশ করেন ঃ

(১) "সর্বোৎকৃষ্ট দিন আরাফার দিন; যদি জুমআর দিনের মুতাবেক হয় তবে তা সত্তর হজ্জ অপেক্ষা উত্তম।" *(রাযীন)*

এ হাদীসটির প্রসঙ্গে আল্লামা শায়খ আলী আল-ক্বারী বলেন, 'কিছু মুহাদ্দেসীন বলেন যে, এই হাদীসের ইসনাদটি যয়ীফ, তা সঠিক মানা গেলেও উদ্দেশ্যে কোন ক্ষতি হয় না। যেহেতু যয়ীফ হাদীস ফাযায়েলে আ'মালে গ্রহণীয় এবং আল্লামা আবুল

হাসানাত লখনবী এই কথা নকল করে বহাল করেছেন। *(আল আজবিবাতুল ফাযেলাহ ৩৭ পৃঃ)*

কিন্তু ভাবার বিষয় যে, কিরূপে এই শ্রদ্ধাভাজন আলিমদ্বয় উপর্যুক্ত শর্ত লংঘন করেছেন। অথবা নিশ্চয় তাঁরা এই হাদীসের সনদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। থাকলে অবশ্যই তা বিবৃত করতেন এবং তার পরিবর্তে বিতর্ক ছলে 'তা মানা গেলেও' এই কথা বলতেন না। অথচ আল্লামা ইবনুল কাইয়েম ঐ হাদীস প্রসঙ্গে মন্তব্য করে বলেন, 'বাতিল, রসূলুল্লাহ ﷺ হতে ওর কোন ভিত্তি নেই, আর না কোন সাহাবী বা তাবেয়ী হতে।' *(যাদুল মাআদ ১/১৭)*

(২) "যখন তোমরা হাদীস লিখবে, তখন তোমরা তার সনদ সহ লিখ। যদি তা সত্য হয়, তাহলে তোমরা সওয়াবের অংশীদার হবে। আর যদি তা বাতিল হয়, তাহলে তার পাপ তার (বর্ণনাকারীর) হবে।' *(আল আজবিবাতুল ফাযেলাহ ঃ ২৬পৃঃ)*

এই হাদীসটি মওযু' (গড়া হাদীস)। *(দেখুন ঃ সিলসিলাতু আহাদীসিয যয়ীফাহ অল মওযুআহ ৮২২নং)* এতদসত্ত্বেও শ্রদ্ধেয় লখনবী সাহেব এর উপর চুপ থেকেছেন। কারণ, এটাও ফাযায়েলে আ'মাল তাই! অথচ এটি এমন একটি হাদীস যা যয়ীফ ও জাল হাদীস প্রচার করতে ও তার উপর আমল করতে সকলকে অনুপ্রাণিত করে। যার মর্মার্থ হচ্ছে নকলকারীর কোন পাপ নেই। অথচ এমন ধারণা আহলে ইলমদের নীতির পরিপন্থী। যেহেতু তাঁদের নীতি এই যে, গড়ার কথা বিবৃত না করে কোন গড়া হাদীস বর্ণনা করাই জায়েয নয়। তদনুরূপ যথার্থতা যাচাইকারী সংস্কারক উলামা; যেমন ইবনে হিব্বান প্রভৃতিগণের নিকট যয়ীফ হাদীসও (তার দুর্বলতা উল্লেখ না করে বর্ণনা বৈধ নয়)।

আল্লামা আহমাদ শাকের বলেন, উপর্যুক্ত তিনটি শর্তাবলী উল্লেখ করা সর্বাবস্থায় ওয়াজেব। কারণ, তা উল্লেখ না করলে পাঠক অথবা শ্রোতার ধারণা হয় যে, তা সহীহ; বিশেষ করে নকলকারী অথবা বর্ণনাকারী যদি উলামায়ে হাদীসের মধ্যে কেউ হন (অথবা দ্বীনের বুযুর্গ হন ও সমাজে মান্য হন); যাঁর প্রতি সকলে হাদীস বিষয়ে রুজু করে তাহলে। যেহেতু যয়ীফ হাদীস গ্রহণ না করায় আহকামে ও ফাযায়েলে আ'মাল ইত্যাদির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বরং সহীহ বা হাসান - যা রসূল ﷺ থেকে শুদ্ধরূপে প্রমাণিত হয়েছে - তা ব্যতীত কোন কিছুতে কারো হুজ্জত বা দলীল নেই।' *(মুখতাসার আল-বায়েসুল হাষীষ ১০১পৃঃ)*

আল্লামা আলবানী বলেন, 'সার কথা এই যে, এই শর্তের পালন কার্যতঃ যে হাদীস (শুদ্ধ বা সহীহ বলে) প্রতিপাদিত নয়, সেই হাদীস দ্বারা আমল ত্যাগ করতে বাধ্য করে। কারণ, সাধারণ মানুষের পক্ষে (যয়ীফ বা দুর্বল হাদীসের) 'অধিক দুর্বলতা জানা (ও চিহ্নিত করা) কঠিন। ফলতঃ এই শর্তারোপ করার অর্থ ও উদ্দেশ্যের সাথে যা

আমরা এখতিয়ার করেছি তার প্রায় মিল রয়েছে এবং সেটাই উদ্দিষ্ট।

দ্বিতীয়তঃ দ্বিতীয় শর্ত থেকে একথাই বুঝা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে আমল যয়ীফ হাদীস দ্বারা নয়, বরং 'সাধারণ ভিত্তি' না থাকলে (কুরআন বা সহীহ সুন্নাহ হতে ঐ আমলের মূল বুনিয়াদ না থাকলে) যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমল হয় না। অতএব এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, এই শর্তের সাথে যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমল করা আপাতদৃষ্ট, বস্তুতঃ নয়। আর সেটাই অভীষ্ট।

তৃতীয়তঃ তৃতীয় শর্তটি হাদীসের দুর্বলতা জানা জরুরী হওয়ার ব্যাপারে প্রথম শর্তেরই অনুরূপ। যাতে আমলকারী তা (সহীহ) প্রমাণিত বলে বিশ্বাস না করে বসে। অথচ বিদিত যে, যারা ফাযায়েলে যয়ীফ হাদীসকে ভিত্তি করে আমল করে তাদের অধিকাংশই হাদীসের দুর্বলতা চেনে না। আর এটা উদ্দেশ্যের বিপরীত।

পরিশেষে স্থূল কথা এই যে, আমরা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মুসলিম জন সাধারণকে এই উপদেশ দিই যে, তাঁরা যেন যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমল করা আদপেই ত্যাগ করেন এবং নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত (সহীহ বা হাসান) হাদীস দ্বারা আমল করতে উদ্যোগী হন। যেহেতু তাতেই যা আছে যয়ীফ হাদীস থেকে অমুখাপেক্ষী করে। (আমলের জন্য তাই যথেষ্ট।) আর ওটাই রসূল ﷺ-এর উপর মিথ্যা বলায় আপতিত হওয়া (ও নিজের ঠিকানা জাহান্নাম করে নেওয়া) থেকে বাঁচার পথ। কারণ, আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় জানি যে, যারা এ বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণ করে তারা উক্ত মিথ্যাবাদিতায় সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। যেহেতু তারা প্রত্যেক সবল-দুর্বল (এবং জাল ও গড়া) হাদীস (এবং অনেক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কেচ্ছা-কাহিনীকে হাদীস ধারণা করে তার দ্বারা) আমল করে থাকে। অথচ নবী ﷺ (এর প্রতি ইঙ্গিত করে) বলেন, "মানুষের মিথ্যাবাদিতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে (অনুরূপভাবে যা পড়ে) তার সবটাই বর্ণনা করে।" *(মুসলিম)*

আর এর উপরেই বলি, মানুষের ভ্রষ্টতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে (বা পড়ে) তার সবটার উপরই (বিচার-বিবেক না করে) আমল করে। (যেহেতু চকচক করলেই সোনা হয় না।) *(দ্রষ্টব্যঃ সহীহুল জামেইস সাগীর, ভূমিকা ৪৯-৫৬পৃঃ, তামামুল মিন্নাহ, ভূমিকা)*

বলাই বাহুল্য যে, যয়ীফ হাদীস দ্বারা ফরয স্বলাতের পর হাত তুলে মুনাজাত প্রমাণ হয় না।

মাগরিবের ফরয স্বলাতের পূর্বে দুই রাকআত নফল স্বলাত কি বিদআত?

মওলানা আব্দুল হাকিম অবিনাশপুরী 'ফাযায়েলে আ'মালে যয়ীফ হাদীস আমলযোগ্য' বলে প্রোপাগাণ্ডামূলক বই লিখতে গিয়ে সহীহ হাদীসসমূহের মর্মমূলেও কুঠারাঘাত করে বসেছেন। তাঁর বইয়ের মধ্যে না আছে ধারাবাহিকতা, বিষয়-বস্তুর স্বচ্ছতা, আর না আছে তাতে বিভিন্ন স্থান হতে নকল করা বিষয়াদির সম্পূর্ণতা।

মাগরিবের ফরয স্বলাতের পূর্বে দুই রাকআত নফল পড়া নিয়ে কুরআন-সুন্নাহপন্থী আলিমদের মধ্যে বিতর্ক আছে বলে অন্ততঃ আমার জ্ঞানে ছিল না। আমি জানতাম, মায্হাবপন্থীদের কেউ কেউ বিভিন্ন বাহানাতে বুখারী-মুসলিমের মত হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত মাগরিবের পূর্বে আদায়যোগ্য দুই রাকআত নফল স্বলাত সম্পর্কিত হাদীসগুলি থেকে দূরত্ব বজায় রাখে। এটা তাদের চরিত্র। তারা সহীহ দলীলের উপর মাযহাবের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। কিন্তু মহামতি লেখক নিজেকে কুরআন-হাদীসপন্থী বলে দাবী করবেন, আবার সহীহ হাদীসকে বিনা দলীলে 'মানসূখ'(কার্যকরী নয়) বলে মন্তব্য করবেন, এটা অন্ততঃ আহলে হাদীসের জন্য শোভনীয় নয়।

আমরা তাঁর দাবীর যথার্থতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার পূর্বে তিনি যে বইয়ের নামকরণ 'সালাতে হাকিম' দিয়ে করেছেন, তা নিয়ে কিছু বলতে চাই। 'সালাত' নয়, স্বলাত; যা আমরা প্রতিনিয়ত পাঁচবার প্রতিষ্ঠিত করি। তা মূলতঃ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বলাতের অনুকরণে। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

صلوا كما رأيتموني أصلي.

স্বলাত ঐভাবেই আদায় কর, যেভাবে আমাকে তোমরা স্বলাত আদায় করতে দেখেছ। *(বুখারী)*

সে জন্য আজাবধি যত লোক স্বলাত সম্পর্কে বই লিখেছেন, তাঁরা ঐ বইয়ের 'নিসবাত' বা সম্পর্ক রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে জুড়ে দিয়েছেন। নতুবা শুধুমাত্র 'নামায শিক্ষা' বা 'দ্বীনিয়াত শিক্ষা' ইত্যাদি নাম দিয়ে ক্ষান্ত হয়েছেন। কিন্তু কেউ দাবী করেননি যে, এটা আমার স্বলাত বা আমার নামায। আব্দুল হাকিম সাহেব কিন্তু বইয়ের নামকরণের মাধ্যমে স্পষ্টতই বুঝাতে চেয়েছেন যে, বইয়ের বক্তব্য-বিষয় তাঁর মস্তিষ্ক-প্রসূত, রসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত নয়। কেননা স্বলাত তো রসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বলাত। আব্দুল হাকিমের স্বলাত নয়। তাছাড়া তিনি যদি 'আব্দুল' শব্দ বিয়োগ করে 'হাকিম' শব্দ দ্বারা 'আল্লাহ'কে বুঝাতে চেয়েছেন, তাহলেও তা ভুল। কেননা,

'হাকিম-আল্লাহ'র স্বলাত কিভাবে হবে? তিনি কি স্বলাত আদায় করেন? স্বলাত তো তাঁরই জন্য বান্দা সকল আদায় করে থাকে।

এখানে একটি কথা স্মরণে রাখা ভাল যে, 'নামায' ইসলামী শব্দ নয়। এটা মুসলমানদের ব্যবহার করা উচিত নয়। অনুরূপভাবে 'রোযা' 'দরূদ' ইত্যাদি শব্দগুলি কোন মতেই ব্যবহারযোগ্য নয়, যদিচও তা আমাদের ভাষার অবিচ্ছেদ্য অংশের রূপ পরিগ্রহণ করেছে।

'সালাতে হাকিম'-এর লেখক বই শুরুতেই বিরোধিতা আরম্ভ করেছেন মাগরিবের ফরযের পূর্বে দুই রাকআত নফলের। আমরা প্রকৃত তথ্য দ্বারা তাঁর ভুল ধারণার নিরসনের প্রয়াস পাব - ইন শাআল্লাহ। এক্ষণে এই স্বলাত সম্পর্কে মহানবী ﷺ হতে কি ধরনের বর্ণনা এসেছে তা খুঁজে দেখার চেষ্টা করি ঃ-

মহানবী ﷺ বলেন, "প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মাঝে স্বলাত আছে।" এইরূপ তিনবার বলার পর শেষে বললেন, "যে চাইবে তার জন্য।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬৬২নং)*

তিনি আরো বলেন, "এমন কোন ফরয স্বলাত নেই, যার পূর্বে ২ রাকআত স্বলাত নেই।" *(ইবনে হিব্বান, ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৩২, সহীহুল জামে' ৫৭৩০নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা মাগরিবের পূর্বে স্বলাত পড়। তোমরা মাগরিবের পূর্বে স্বলাত পড়।" অতঃপর তৃতীয়বারে তিনি বলেন, "যে চায় সে পড়বে।" এ কথা বলার কারণ, তিনি ঐ স্বলাতকে লোকেদের (জরুরী) সুন্নত মনে করে নেওয়াকে অপছন্দ করলেন। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১১৬৫নং)*

আনাস رضي الله عنه বলেন, আমরা মদীনায় ছিলাম। মুআয্যিন যখন মাগরিবের আযান দিত, তখন লোকেরা প্রতিযোগিতার সাথে মসজিদের খাম্বাগুলোর পশ্চাতে ২ রাকআত স্বলাত পড়তে লেগে যেত। এমনকি যদি কোন অজানা লোক এসে মসজিদে প্রবেশ করত, তাহলে এত লোকের স্বলাত পড়া দেখে সে মনে করত, হয়তো মাগরিবের জামাআত হয়ে গেছে। (এবং ওরা পরের সুন্নত পড়ছে।) *(মুসলিম, মিশকাত ১১৮০ নং)*

মারষাদ বিন আব্দুল্লাহ বলেন, আমি উক্ববাহ আল-জুহানীর নিকট এসে বললাম, আমি কি আবূ তামীমের একটি আশ্চর্য খবর বলব না? উনি মাগরিবের স্বলাতের আগে ২ রাকআত স্বলাত পড়েন! উক্ববাহ رضي الله عنه বললেন, আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যামানায় তা পড়তাম। আমি বললাম, তাহলে এখন আপনাকে পড়তে বাধা দেয় কিসে? তিনি বললেন, কাজ বা ব্যস্ততা। *(বুখারী, মিশকাত ১১৮১নং)*

বহু মাসায়েলের মত এ মাস্আলাতেও মতভেদ করেছেন উলামাগণ। প্রসিদ্ধ ও

সহীহ হাদীসে থাকা সত্ত্বেও তাঁরা মনে করেন এ স্বলাত বিদআত। কেউ কেউ মনে করেন, তা মনসূখ (কার্যরহিত)। তার বিভিন্ন কারণ আছে; যেমন ঃ-

১। **এ স্বলাত আল্লাহর নবী ﷺ পড়েননি।** (সালাতে হাকিম ২পৃঃ)

এ স্বলাত মহানবী ﷺ পড়েছেন বলে হাদীস বর্ণিত আছে। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২৩৩নং)* কিন্তু মতান্তরে তা সহীহ নয়। *(তামামুল মিন্নাহ, আলবানী ২৪২পৃঃ)* বরং হযরত আনাস ؓ বলেন, 'আমরা আল্লাহর রসুল ﷺ-এর যুগে সূর্য ডোবার পর মাগরিবের স্বলাতের আগে ২ রাকআত স্বলাত পড়তাম।' এ কথা শুনে তাবেয়ী মুখতার বিন ফুলফুল তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ কি ঐ ২ রাকআত স্বলাত পড়তেন?' উত্তরে আনাস ؓ বললেন, 'তিনি আমাদেরকে তা পড়তে দেখতেন। কিন্তু সে ব্যাপারে আমাদেরকে কিছু আদেশও করতেন না এবং নিষেধও করতেন না।' *(মুসলিম, মিশকাত ১১৭৯নং)*

কিন্তু তিনি পড়েছেন কি না, তা বিতর্কিত হলেও তিনি নিঃসন্দেহে পড়তে আদেশ করেছেন এবং পড়তে দেখে নিষেধ করেননি। আর তা এ কথারই প্রমাণ যে, তা মুস্তাহাব।

আল্লামা আলবানী মিশকাতের (১/৩৭০) আনাসের হাদীসের টীকায় বলেন,

فهما مستحبتان، ونفي الأمر بهما لا يستلزم نفي المندوبية ـ كما توهم البعض ـ لأنها صلاة، فهي عبادة أقرها رسول الله ﷺ، فتبقى على الأصل، وهو المشروعية والاستحباب، إلا بنهي وهو منفي، بل ثبت الأمر بهما على التخيير كما تقدم، فهو يفيد المندوبية أيضاً.

'সুতরাং ঐ দুই রাকআত স্বলাত মুস্তাহাব। (তিনি আমাদেরকে তা পড়তে দেখতেন। কিন্তু সে ব্যাপারে আমাদেরকে কিছু আদেশও করতেন না) এই আদেশ না করা তা মুস্তাহাব না হওয়ার দলীল নয়; যেমন অনেকে ধারণা করে থাকেন। কারণ তা হল স্বলাত। তা এমন একটি ইবাদত, আল্লাহর রসূল ﷺ যার স্বীকৃতি দিয়েছেন ও অনুমোদন করেছেন। সুতরাং তা মূল হিসাবে অব্যাহত থাকবে। আর মূল হল, তা বিধেয় ও মুস্তাহাব। অবশ্য নিষেধ থাকলে সে কথা ভিন্ন। বরং তার পড়া-না পড়ার ব্যাপারে এখতিয়ার প্রমাণিত হয়েছে; যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে। আর তাও ঐ স্বলাত মুস্তাহাব হওয়ার কথাই নির্দেশ করে।'

আল্লামা ইবনে উষাইমীন উক্ত হাদীসের টীকায় বলেন,

وهذا إقرار منه على هذه الصلاة، فثبت الفصلُ بالسُّنَّة القوليَّة والسنَّة الإقرارية.

'এ হল তাঁর তরফ থেকে মাগরিবের পূর্বে ঐ স্বলাতের স্বীকৃতি। সুতরাং তা দিয়ে

মাগরিবের আযান ও ইকামতের মাঝে ব্যবধান উক্তিমূলক ও স্বীকৃতিমূলক উভয় সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত হল। *(আল-মুমতে' ১/৫৮)*

২। **খুলাফায়ে রাশেদীন - চার খলিফা ঐ দুরাকাত নামায পড়তেন না বা অভিমত পোষণ করতেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বলা হয়, চার খলিফার আদর্শ ও মতবাদের উপর এতেকাদ ও অনুসরণ করাই যথেষ্ট।** *(সালাতে হাকিম ১পৃঃ)*

শুধু চার খলীফাই কেন, সারা বিশ্বের মানুষ যদি একধার হয়ে যায় এবং আমাদের মহানবী ﷺ-এর আদর্শ যদি অন্য ধারে যায়, তাহলে সব ছেড়ে দিয়ে মহানবী ﷺ-এর আদর্শের উপর ই'তিকাদ ও তাঁর অনুসরণ করা অপরিহার্য।

মহান আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি (রাষ্ট্রনেতা ও উলামাদের) আনুগত্য কর। আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মতভেদ ঘটে তবে সে বিষয়কে তোমরা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি ফিরিয়ে দাও। এটিই তো উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।" *(সূরা নিসা ৫৯ আয়াত)*

"কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার-ভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে না নেয়।" *(সূরা নিসা ৬৫ আয়াত)*

সঙ্গে কুরবানীর পশু না থাকলে আবূ বাক্র ؓ ও উমার ؓ ইফরাদ হজ্জকে উত্তম মনে করতেন। পক্ষান্তরে সহীহ সুন্নাহতে তামাত্তু হজ্জ উত্তম হওয়ার ব্যাপারে বর্ণনা আছে। সেই ভিত্তিতে ইবনে আব্বাস ؓ তামাত্তু হজ্জ উত্তম বলে ফতোয়া দিতেন। কিন্তু কেউ কেউ আবূ বাক্র ও উমারের কথা বললে তিনি বলেছিলেন, "অতি সত্বর তোমাদের উপর পাথর বর্ষণ হবে। আমি বলছি, 'আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন।' আর তোমরা বলছ, 'আবূ বাক্র ও উমার বলেছেন।'" *(আহমাদ ১/৩৩৭, এর সনদটি দুর্বল। অবশ্য উক্ত অর্থেই সহীহ সনদে মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাকে একটি আষার বর্ণিত হয়েছে। দেখুনঃ যাদুল মাআদ ২/১৯৫, ২০৬)*

একই ব্যাপারে আব্দুল্লাহ বিন উমার ؓ-কে এক ব্যক্তি বলল, 'আপনার আব্বা তো তামাত্তু হজ্জ করতে নিষেধ করেছেন।' এ কথা শুনে তিনি তাকে বললেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ-এর আদেশ অধিক মানার যোগ্য, নাকি আমার আব্বার?' *(যাদুল মাআদ ২/১৯৫)*

বাকী থাকল চার খলীফা তা পড়তেন না। তো এ ব্যাপারে আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রঃ) বলেন, (যয়লয়ী ইব্রাহীম নাখয়ী কর্তৃক যে হাদীস বর্ণনা করেছেন,)

এ হাদীস দলীল হওয়ার যোগ্য নয়। কারণ তা মু'যাল (যয়ীফ)। তাছাড়া ইব্রাহীম নাখয়ী আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ছাড়া কোন সাহাবীকে দেখেননি, তাহলে তিনি চার খলীফার হাল কিভাবে জানলেন? তিনি যে আষার বর্ণনা করেন, তার একটির সনদে রয়েছে পরিচয়হীন রাবী এবং অন্যটির সনদে রয়েছে ছিন্নতা। সুতরাং এ দিয়ে প্রমাণ করা যায় না যে, তাঁরা তা পছন্দ করতেন না। অবশ্য তাঁরা তা নাও পড়তে পারেন। যেহেতু তা ত্যাগ করা মুবাহ। যেহেতু নবী ﷺ বলেছেন, "যে চাইবে তার জন্য।" *(দেখুনঃ তুহফাতুল আহওয়াযী)*

অতএব এ কথা প্রমাণ হয় না যে, চার খলীফা ঐ স্বলাত পড়েননি। আর বাকী সাহাবাগণ যে পড়েছেন, তার কথা উপর্যুক্ত আনাস ও মারষাদের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। নবী ﷺ-এর জীবদ্দশায় এবং তাঁর তিরোধানের পরেও সাহাবী, তাবেয়ী ও সলফগণ মাগরিবের ফরয স্বলাতের পূর্বে ২ রাকআত ঐ স্বলাত পড়ে গেছেন। যাঁরা পড়েননি অথবা কখনো কখনো পড়েছেন, তাঁদের জন্য তা বৈধ ছিল। যেহেতু তাতে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে 'লিমান শা-আ' (যে চাইবে তার জন্য) বলে। পক্ষান্তরে কেউ কেউ তা নিয়মিত পড়ে গেছেন। আবূ দারদা বলতেন, 'আমাকে চাবুক দিয়ে মারা হলেও ঐ দুই রাকআত ছাড়ব না।' যেহেতু "স্বলাত হল শ্রেষ্ঠ ইবাদত ও বিধান।"

৩। আব্দুল হাকিম সহ অন্যান্যরা বলেন, উপরোক্ত হাদীসগুলি **মানসূখ। রহিত, প্রত্যাহৃত**। আর নাসেখ (প্রত্যাহারকারী) হাদীস হল তিনটি ঃ-

(ক) ইব্রাহীম নাখয়ী বলেন, চার খলীফা ঐ স্বলাত পড়েননি।

(খ) ইবনে উমার বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যুগে ঐ স্বলাত পড়তে কাউকে দেখিনি।

(গ) বুরাইদাহ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "মাগরিব ছাড়া প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মাঝে স্বলাত আছে।" *(দারাকুত্বনী, বাইহাক্বী) (সালাতে হাকিম ২-৪পৃঃ)*

প্রথমতঃ এ কথা জ্ঞাতব্য যে, নাসেখ হাদীসকে শক্তিশালী হতে হবে। নাসেখ হাদীস যদি দুর্বল হয়, তাহলে তো তা সহীহ হাদীসের নাসেখ হতে পারে না।

এখন দেখা যাক, ঐ নাসেখ হাদীসগুলোর অবস্থা কি?

(ক) ইব্রাহীম নাখয়ীর আষার (উক্তি) ধোপে টিঁকে না। কারণ, অজ্ঞাত-পরিচয় রাবী ও ছিন্ন সনদযুক্ত আষার দিয়ে বুখারীর মারফূ' হাদীসকে মনসূখ করা যায় না। তা ছাড়া কোন সাহাবী কোন হাদীস অনুযায়ী আমল না করলেই, তা মনসূখ হয়ে যায় না। যতক্ষণ না সাহাবী স্পষ্ট করে বলবেন যে, তা মনসূখ বা রহিত।

(খ) ইবনে উমার رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত ঐ আষারও সহীহ নয়। এ ব্যাপারে ইবনে হায্‌ম

বলেন,

(إنه لا يصح لأنه عن أبي شعيب أو شعيب ولا ندري من هو).

অর্থাৎ, এটি সহীহ নয়। কারণ, তা আবূ শুআইব অথবা শুআইব সূত্রে বর্ণিত। আর জানি না যে, সে কে? (অর্থাৎ, রাবী পরিচয়হীন।) *(আল-মুহাল্লা ২/২৫৪, আয্‌-যামারুল মুস্তাত্বাব, আলবানী ১/৬৩, যয়ীফ আবূ দাঊদ)*

তা ছাড়া ইবনে উমার رضي الله عنه-এর ঐ স্বলাত পড়তে না দেখার কারণে বুখারীর বিশুদ্ধতম হাদীস মনসূখ হয়ে যায় না। বরং তিনি না দেখলেও অন্য সাহাবাগণ তো দেখেছেন; যেমন আনাসের আষারে বর্ণিত হয়েছে।

(গ) বুরাইদা رضي الله عنه-এর হাদীসও সহীহ নয়। যেহেতু তার সনদে হাইয়ান রাবী মিথ্যুক। আর এই জন্যই ইবনুল জাওযী এই হাদীসকে তাঁর 'মাওযূআত' গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। সুতরাং এ হাদীস সহীহ হাদীসকে মনসূখ করতে পারে না।

তাছাড়া বুখারী শরীফের ঐ সহীহ হাদীসের রাবীও খোদ বুরাইদা رضي الله عنه-এর ছেলে আব্দুল্লাহ। আর ঐ তথাকথিত 'নাসেখ' হাদীসের রাবীও তিনি। সুতরাং যদি ঐ হাদীসে বর্ণিত 'মাগরিব ছাড়া' কথাটি শুদ্ধ হত, তাহলে তিনি এর বিপরীত হাদীস বর্ণনা করতেন না।

পক্ষান্তরে খোদ বুরাইদা ও তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ মাগরিবের পূর্বে ঐ দুই রাকআত স্বলাত পড়তেন। *(দেখুন, ফাতহুল বারী ২/৪৩২, তুহফাতুল আহওয়াযী ১/২১৩, মিরআতুল মাফাতীহ ৪/১৪০)*

আল্লামা মুবারকপুরী (রঃ) তিরমিযীর হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,

وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ وَقَبْلَ صَلَاتِهِ وَهُوَ الْحَقُّ ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ مِمَّا لَا اِلْتِفَاتَ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ.

অর্থাৎ, হাদীসটি মাগরিবের আযানের পর এবং (ফরয) স্বলাতের পূর্বে দুই রাকআত স্বলাত পড়ার বৈধতার দলীল। আর এটাই হল হক। পক্ষান্তরে ঐ স্বলাত মনসূখ হওয়ার কথাটি ভ্রূক্ষেপযোগ্য নয়। যেহেতু সে কথার কোন দলীল নেই।

ইমাম নাওয়াবী বলেন,

وَأَمَّا مَنْ زَعَمَ النَّسْخ فَهُوَ مُجَازِف ؛ لِأَنَّ النَّسْخ لَا يُصَار إِلَيْهِ إِلَّا إِذَا عَجَزْنَا عَنْ التَّأْوِيل وَالْجَمْع بَيْن الْأَحَادِيث وَعَلِمْنَا التَّارِيخ ، وَلَيْسَ هُنَا شَيْء مِنْ ذَلِكَ .

অর্থাৎ, আর যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, ঐ স্বলাত মনসূখ, সে একজন (বিনা প্রমাণে) ধারণাকারী মাত্র। যেহেতু মনসূখ তখনই বলা যেতে পারে, যখন পরস্পর-বিরোধী

হাদীসের ব্যাখ্যা ও তার মাঝে সামঞ্জস্য সাধন করতে অক্ষম হয়ে যাব এবং কোন্‌টি আগের ও কোন্‌টি পরের হাদীস তার ইতিহাস জানতে পারব। আর এখানে তার কিছুই নেই। *(শারহু মুসলিম ৩/ ১৯৬)*

আল্লামা উবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী (রঃ) বলেন,

والحديث دليل على استحباب الركعتين بين الغروب وصلاة المغرب، وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين، ومن المتأخرين أحمد وإسحاق وأصحاب الحديث، وهو الحق، والقول بأنه منسوخ مما لا التفات إليه، لأنه لا دليل عليه.

অর্থাৎ, সূর্য ডোবা ও মাগরিবের (ফরয) স্বলাতের পূর্বে দুই রাকআত স্বলাত মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে এই হাদীসটি (স্পষ্ট) দলীল। সাহাবা ও তাবেঈনদের একটি জামাআত এ কথাই বলেন। পরবর্তী আলিমগণের মধ্যে আহমাদ (ইবনে হাম্বাল), ইসহাক (ইবনে রাহওয়ায়হ) ও মুহাদ্দিসগণ এ কথাই বলেছেন। আর এটাই হল সঠিক কথা। আর এটাকে মানসূখ বলাটা এমন বিষয়, যাকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রশ্নই নেই। কেননা, সেটা বেদলীল কথা। *(মিরআতুল মাফাতীহ ৪/ ১৩৮)*

হানাফী মযহাবের বিভিন্ন টীকা-টিপ্পনী থেকে মনসূখ হওয়ার মত গ্রহণ করে যদি 'হুব্বে আলী নেহী বুগযে মুআবিয়া' প্রকাশ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ছেড়ে দিন ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা, কারণ ওটাও ওঁরা মনসূখ বলেন। ছেড়ে দিন রফয়ে য়্যাদাইন, কারণ সেটাও ওঁদের মতে মনসূখ। এইভাবে বহু কিছু পাবেন, যা অনেকে মনসূখ বা যয়ীফ বলেছেন অথচ তা আহলে হাদীসের নিকট আমলযোগ্য শুধু এই জন্য যে, তাঁরা বিনা কোন অন্ধপক্ষপাতিত্বে যাচাই-বাছাই করে সহীহ হাদীস দ্বারা আমল করেন।

আক্কেলের ঘোড়া ছুটিয়ে সহীহ হাদীসকে রদ্দ করার মত যখন কোন পথ পান না, তখন ওঁদের জন্য শেষপথ দুটি খোলা থাকে; এক হল তা'বীল (অপব্যাখ্যা) এবং দুই হল মনসূখ বলা। ওঁদের এক ইমাম আবুল হাসান কারখী বলেন,

كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ.

অর্থাৎ, প্রত্যেক সেই আয়াত, যা আমাদের মযহাবপন্থীদের মযহাবের পরিপন্থী তা হয় ব্যাখ্যেয় অথবা মনসূখ (রহিত)। আর প্রত্যেক অনুরূপ হাদীসও ব্যাখ্যেয় অথবা রহিত!! *(আর্দুর্রুল মুখতার ১/৪৫ টীকা, আল-হাদীস হুজ্জাতুন বিনাফসিহ, আলবানী ১/৮৮)*

সুতরাং যদি আপনি সহীহ হাদীসপন্থী হন, তাহলে অন্ধপক্ষপাতিত্ব ছেড়ে সহীহ হাদীসের ফায়সালা শিরোধার্য করুন, তাহলেই মনের আঁধার কেটে যাবে।

৪। হাফেয মাহমূদুল হাসান সাহেব তাঁর অভিমতে বলেছেন, **'অন্য দিকে মাগরেবের আসল নামায লৈ হয়ে যায়।'**

মওলানা আব্দুল হাকীম সাহেব বলেছেন, **'উক্ত দুই রাকআত ঐ সময় পড়ার কারণে মাগরেবের ফরয নামায তাখির বা লেট হয়ে যায়। হযরত মা আয়েশার (রাঃ) হাদিসে (মুসলিম শরীফ তাজিলুস সালাত) মাগরেবের ফরয নামায লেট করে পড়ার ফাতওয়া নাই। বরং জলদি পড়ার কথা উল্লেখ আছে। আল্লার রাসূল রোযা খুলেছেন তাড়াতাড়ি এবং মাগরিবের নামাযও তাড়াতাড়ি পড়েছেন।'** কেউ বলেন, **'মাগরেবের আওয়াল অক্ত চলে যায়।'** *(সালাতে হাকিম ২-৩পৃঃ)*

মুবারকপুরী (রঃ) বলেন, এ কেবল একটি দাবী, যার কোন দলীল নেই। সুতরাং তা ভ্রূক্ষেপযোগ্য নয়। (ঐ)

ইমাম নাওয়াবী বলেন, যাঁরা বলেন যে, ঐ দুই রাকআত স্বলাত পড়লে মাগরিব 'তাখির' (দেরী) হয়ে যাবে, তাঁদের এই চিন্তাধারা বেকার এবং সুন্নাহ পরিপন্থী। তাছাড়া ঐ স্বলাত পড়ার জন্য যে সময় লাগে তা তো নেহাতই সামান্য, তাতে আওয়াল অক্ত থেকে তা'খীর হয় না। *(শারহু মুসলিম ১/ ১৯৬)*

হাফেয ইবনে হাজার বলেন, বিভিন্ন দলীলসমূহের সমষ্টি এই নির্দেশনা দেয় যে, এই স্বলাত হাল্কা করা মুস্তাহাব, যেমন ফজরের দু' রাকআত সুন্নত হয়। *(ফাতহুল বারী ২/৪৩২)*

'মাগরেবের নামাযের পর তীর পড়ার জায়গা দেখা যেতে হবে।' অবশ্যই দেখা যাবে। এ স্বলাত পড়তে বড় জোর ২/৩ মিনিট লাগে। আর তাতে কোন পার্থক্য সূচিতই হয় না। মক্কা-মদীনায় মাগরিবের আযানের ৫-১০ মিনিট পর জামাআত শুরু হয়। তাহলে কি তাঁরা লেট করে পড়েন? আমি আমার ছাত্র জীবন থেকে এ যাবৎ নিজে পড়ি ও বহু স্থানে এই আমল শুরু করিয়েছি। জামাআত শেষে কই ঐ ঔজ্জ্বল্য তো শেষ হয়ে যায় না, যাতে তীর পড়ার জায়গা দেখা যায়। কিন্তু মাগরিবের আযান দেরীতে দিলে (যেমন হানাফীরা করে) অথবা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন বা কুয়াশাচ্ছন্ন থাকলে তা কি আর সম্ভব?

তাছাড়া আযান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জামাআত শুরু করাটাও তো অন্যায়। 'এস স্বলাত পড়তে, এস কল্যাণ লভতে' বলে লোকেদেরকে আহবান জানিয়ে সাথে না নিয়ে জামাআত শুরু করে দিলাম - এটা কি ঠকানো নয়?

সঊদী আরবের ফকীহ ইবনে উষাইমীন (রঃ) বলেন, মাগরিবের স্বলাত সত্বর পড়তে হবে। যেহেতু নবী ﷺ সূর্য ডোবার পরে তা পড়তে শীঘ্রতা প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু এই শীঘ্রতার মানে এই নয় যে, আযানের পরপরই ইকামত দিতে হবে। যেহেতু

নবী ﷺ মাগরিবের পূর্বে স্বলাত পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাহাবাগণ তা পড়েছেন। এ হল এ কথার দলীল যে, আযানের পর লোক স্বলাতের জন্য শীঘ্রতা করবে, কিন্তু অন্য লোকেদের ওযূ ও দু' রাকআত স্বলাত পড়ার মত সময় দেরী করবে। *(আল-মুমতে' ১/৯০)*

সুতরাং বুঝতেই পারছেন, ঐ ওযর ঐ স্বলাতকে অবৈধ বা বিদআত করতে পারছে না। বুখারী-মুসলিম (সহীহায়নের) হাদীসকে রদ্দ করার মত চোরা ছিদ্রপথ ও খোঁড়া ওযর ও যুক্তি থাকছে না। কই? এ সব ওযর তো রোযা ইফতারী করার সময় দেখান না।

৫। **'নামাযটি সুন্না হয়ে যাবে ভেবে আশংকায় আল্লাহর রাসূল (সাঃ)এর মনে কারাহিয়্যাত হয়েছে।'** *(প্রাগুক্ত ৩পৃঃ)*

আর তার জন্যই কি 'ফাকিহ লায়েস, ইমাম ফাকিহ নাখ্য়ী' ঐ স্বলাতকে বিদআত বলেছেন? কক্ষনো না। তাঁদের নিকট বিপরীত হাদীস ছিল বলেই তাঁরা বিদআত বলেছেন। অথচ সে হাদীস সহীহ নয়। আর তাঁরা তো বুখারী-মুসলিম চোখেই দেখেননি। কারণ এঁরা বুখারী-মুসলিমের বহু পূর্বের ফকীহ। হয়তো বা তাঁদের নিকট ঐ সকল সহীহ হাদীস পৌঁছেনি; যেমন আমরা ইমামে আ'যম আবূ হানীফা (রঃ)এর জন্য বলে থাকি।

সুতরাং অপছন্দ ও সুন্নাহর বিপরীত মানেই বিদআত নয়। ইমাম মুহিব্ব আত-ত্বাবারী বলেন, (তিনি ঐ স্বলাতকে লোকেদের 'সুন্নত' মনে করে নেওয়াকে অপছন্দ করলেন।) এই উক্তি দ্বারা নবী ﷺ-এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, তা মুস্তাহাব নয়। যেহেতু এটা অসম্ভব যে, যা মুস্তাহাব নয়, তার তিনি (তিন তিনবার) আদেশ করবেন। বরং এই হাদীস ঐ দু' রাকআত স্বলাত মুস্তাহাব হওয়ার সবচেয়ে বলিষ্ঠ দলীলসমূহের অন্যতম। তাঁর 'সুন্নত' কথার উদ্দেশ্য হল, জরুরী সুন্নত, অপরিহার্য তরীকা ও শরীয়ত। যেন তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, তা ফরযের মর্যাদায় নয়। *(ফাতহুল বারী ৪/১৮৩)*

যেহেতু তিন তিনবার আদেশ ফরয হওয়ারই দাবী রাখে। তাঁর এই তাকীদ শুনে লোকে যেন 'জরুরী' বা 'ফরয' মনে না করে বসে, তাই শেষে ঐ উক্তি জুড়ে দিয়েছেন।

ইমাম ইবনে হাজার আস্কালানী কি মত পোষণ করেছেন? তিনি বলেছেন,

وَأَمَّا كَوْنُهُ ﷺ لَمْ يُصَلِّهِمَا فَلَا يَنْفِي الِاسْتِحْبَاب ، بَلْ يَدُلّ عَلَى أَنَّهُمَا لَيْسَتَا مِنْ الرَّوَاتِب.

অর্থাৎ, নবী ﷺ ঐ স্বলাত না পড়লেও তা মুস্তাহাব হওয়ার খণ্ডন হয় না। বরং তা এই কথার দলীল যে, ঐ স্বলাত সুন্নাতে রাতেবাহ বা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ নয়।

(ফাতহুল বারী ২/৪৩২)

৬। **'নাখ্য়ী, লাইস ইমাম বুখারী ইত্যাদি থেকে বড়।'** আর তার মানে কি বড়দের কথা মেনে নিতে হবে; যদিও তা সহীহ হাদীসের খেলাপ হয়? যেমন ওঁরা বলেন, ইমাম আবূ হানীফা ও ফিকাহ আগে এসেছে এবং বুখারী-মুসলিম ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থ পরে এসেছে। আর তার মানে ছোটদের হাদীস না মেনে বড়দের কথা মেনে নিতে হবে। কারণ হাদীস বড়দেরই বেশী জানার কথা।

অবশ্যই তা নয়। আবূ বাকর মর্যাদায় বড় হলেও হাদীসে আবূ হুরাইরা বড়। আবূ বাকরকেও আবূ হুরাইরার হাদীস মানতে হবে। প্রত্যেক বড় বড় ইমামগণ বলে গেছেন, 'হাদীস সহীহ হলে, সেটাই আমার মযহাব।' এই হিসাবে সহীহ হাদীসের মযহাব তাঁদেরই মযহাব। আর এ কথাও সত্য যে, ইমাম নাখয়ী ও আবূ হানীফার যুগে হাদীস সংগ্রহের সেই তৎপরতা শুরু হয়নি, যা পরবর্তীকালে শুরু হয়। আর তার ফলেই ঐ সকল ইমামগণ বেশী হাদীস জানতেন না এবং বহু সমস্যার সমাধান 'রায়' দ্বারা দিয়ে গেছেন।

সুতরাং ইমাম নাখ্য়ী ও লাইস বয়সে বড় আর তাঁরা মাগরেবের পূর্বে ঐ স্বলাতকে বিদআত বলেছেন এবং ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ এঁরা বয়সে ছোট বলে তাঁদের কিতাবে বর্ণিত সহীহ হাদীসকে রদ্দ করে দিতে হবে - এ যুক্তি একটি অবাস্তব, বিকলপদ ও পঙ্গু যুক্তি।

ওঁরা বড় ও আগে। তার মানে কি এই যে, হাদীস পরে তৈরী করা হয়েছে। হাদীস না থাকলে ফিকাহ এল কোত্থেকে? বড়র কথা মানতে হলে তো সকলকে 'হানাফী' হওয়া দরকার। কিন্তু সবার থেকে বড় ও আগে কি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ নন?

৭। **'ইমাম জাউযী সমস্ত মাউযু হাদীসগুলি এক স্থানে জমা করে তা হাদিস আকারে প্রকাশ করে তার নাম দিয়েছেন মাউযুআতে ইমাম জাউযী। আব্দুল্লাহ বিন মুগাফ্ফালের ঐ হাদিসটি মাউযুআতে ইমাম জাউযীতে স্থান দিয়েছেন, কেন? অয়াল্লাহো আলামো।'** *(সালাতে হাকিম ৫পৃঃ)*

তার মানে তাহলে মাগরিবের পূর্বে ঐ দু' রাকআত স্বলাতের হাদীসটি মাউযু বৈকি? ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজেঊন।

وكم من عائب قولا صحيحا ... وآفته من الفهم السقيم

বেশী কথা বললে, বেশী ভুল বলা হয়ে যাবে। আগেই বলেছি, যোগ্য আলিম পৃথিবী থেকে বিদায় নিলে, অযোগ্য লোকেরা মুফতী হবে। আর তারা বিনা ইল্‌মে ফাত্‌ওয়া দিয়ে নিজেও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যকেও গুমরাহ করবে।

এখানে আব্দুল হাকীম সাহেব কামাল করে দিয়েছেন। তিনি এখানে সহীহ হাদীসকে

আরাবী ইবারত বুঝতে না পেরে মাউযূআতের মধ্যে গণ্য করেছেন। আর তাঁর এই কারনামাকে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন একাধিক মাদ্রাসার শাইখুল হাদীসগণ! আল্লাহ এমন লেখক ও তাঁর পৃষ্ঠপোষকদের হতে আমাদেরকে রক্ষা করেন। জানি না, এঁরা ছাত্রদেরকে কি মন্ত্র শিখাচ্ছেন?

এবার আব্দুল হাকিম সাহেবের উক্ত ধাঁধাঁময় হিকমতের রহস্য জেনে নিন। আসলে তুহফাতুল আহওয়াযীতে রয়েছে,

قَالَ وَكَانَ اِبْنُ بُرَيْدَةَ يُصَلِّي قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي رِوَايَةِ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ خَشْيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ اِنْتَهَى . وَذَكَرَ اِبْنُ الْجَوْزِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَنَقَلَ عَنْ الْفَلَّاسِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ حَيَّانُ هَذَا كَذَّابًا.

অর্থাৎ, বুরাইদাহ মাগরিবের পূর্বে দু রাকআত (নফল) স্বলাত পড়তেন। হুসাইন মুআল্লিমের বর্ণনায় আব্দুল্লাহ বিন বুরাইদাহ আব্দুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মাগরিবের পূর্বে দু' রাকআত স্বলাত পড়। তৃতীয়বারে বললেন, যে চাইবে তার জন্য। (যে চাইবে তার জন্য) কথাটি এই আশংকায় বললেন যে, হয়তো লোকেরা তাকে (স্থায়ী বা জরুরী) সুন্নত বানিয়ে নিবে। এই হাদীসটিকে বুখারী তাঁর সহীহতে বর্ণনা করেছেন। ইন্তিহা (কথা শেষ)। আর এই হাদীসটিকে ইবনুল জাওযী 'মাউযূআত'-এ উল্লেখ করেছেন এবং তিনি ফাল্লাস হতে নকল করেছেন যে, তিনি বলেছেন, এই 'হাইয়ান' বড় মিথ্যাবাদী ছিল।

আল্লামা মুবারকপুরী (রঃ) আসলে বুখারীর হাদীসের কথা 'ইন্তিহা' বলে শেষ করে তারপরে বুরাইদার সেই নাসেখ হাদীসের জন্য বলেছেন, যাতে বলা হয়েছে, 'সাওয়াল মাগরেব' (মাগরিব ছাড়া) প্রত্যেক আযান ও ইক্বামতের মাঝে স্বলাত আছে, সেইটিকে ইবনুল জাউযী 'মাউযূআত'-এ উল্লেখ করেছেন। যেহেতু তার সনদে ঐ 'হাইয়ান' নামক রাবী রয়েছে, যে মিথ্যুক। (দেখুন ঃ আল-মাউযূআত, ইবনুল জাউযী ২/৯২, তাযকিরাতুল মাওযূআত ১/৩৬)

কিন্তু যেহেতু আব্দুল্লাহ বিন মুগাফ্ফালের হাদীস উল্লেখ করার পর মাউযূআতের কথা এসে গেছে এবং যেহেতু ঐ স্বলাতের প্রতি মনে প্রতি অনীহা বিরাজ করছে, সেহেতু লেজ তুলে না দেখে অনন্য গবেষক আব্দুল হাকিম সাহেব অমৃতকে গরল মনে করে অবাক হয়ে বলেছেন, **'আব্দুল্লাহ বিন মুগাফ্ফালের ঐ হাদিসটি মাউযুআতে ইমাম জাউযীতে স্থান দিয়েছেন, কেন? অয়াল্লাহো আলামো।'**

এখানে ইবনুল জাওযী 'ফাল্লাস' হতে 'হাইয়ান' নামক বর্ণনাকারীর মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন, আর সে কারণেই হাদীসটি জাল।

তিনি একবারের জন্যও নজর তুলে ভেবে দেখলেন না যে, বুখারীর ঐ হাদীসটির সনদে 'হাইয়ান' নামক 'রাবী' আছে কি না? তাছাড়া যেখানে বুখারীতে (জাল তো দূরের কথা) কোন যয়ীফ হাদীসও স্থান পায়নি বলেই সেটা 'আসাহ্হুল কুতুব', সেখানে কি করে তাঁর মনের কুঠুরীতে এমন খারাপ চিন্তা স্থান পেল? আল্লাহ আমাদেরকে তুমি রক্ষা কর।

দেখুন! অনেকে এইভাবে ভুল বুঝে সমাজে কত বড় সর্বনাশ ডেকে আনে!

সম্মানিত আলিম ভায়েদের জন্য মঙ্গল কামনা করেই একটি 'আম' হাদীস উপস্থাপন করছি ঃ-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا طَبِيبٍ تَطَبَّبَ عَلَى قَوْمٍ لَا يُعْرَفُ لَهُ تَطَبُّبٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَعْنَتَ فَهُوَ ضَامِنٌ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন চিকিৎসক যদি কারো চিকিৎসা করে অথচ এর পূর্বে সে চিকিৎসক হিসেবে খ্যাত ছিল না, অতঃপর (অজ্ঞানতাবশতঃ) রোগীকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়, তাহলে সে দায়ী হবে। *(আবূ দাউদ ৪৫৮৬নং, নাসাঈ ২/২৫০, ইবনে মাজাহ ৩৪৬৬নং, দারাকুত্বনী ৩৭০পৃঃ, হাকেম ৪/২১২, বাইহাক্বী ১৪১নং)*

৮। 'সালাতে হাকিম'-এর উপর মন্তব্য করতে গিয়ে মাহমূদুল হাসান সাহেব লিখেছেন, **'ফরয নামায ছাড়া, অন্য নামায বাড়িতেই উত্তম, এর সাদ আলাদা হাদিসে বলা হয়েছে, মাগরেবের আগের ঐ নামায রিয়া হচ্ছে বা শির্ক্।'** *(ঐ পৃঃ ছ)*

ফরয ছাড়া অন্য স্বলাত বাড়িতে পড়া উত্তম। কিন্তু তা সত্ত্বেও লোকেরা তো অন্য স্বলাত মসজিদে পড়ছে। তাতেও কি রিয়া বা শির্ক হচ্ছে? মাগরিবের পরের সুন্নত মসজিদে পড়লে যদি শির্ক না হয়, তাহলে পূর্বের ঐ দু' রাকআত শির্ক হবে কেন? তাছাড়া স্বলাতের রিয়া বা শির্ক তো মনের ব্যাপার। আর তা তো ফরয স্বলাতেও হতে পারে। তাই নয় কি?

৯। তিনি আরো লিখেছেন, **'ঐ নামাযটা পড়তে খুশূ-খুযূ থাকে না।'** (ঐ)

'খুশূ-খুযূ' ও মনের জিনিস; তা আনতে হয়। আসলে কিছু লোক ঐ স্বলাত পড়া হাঁ করে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে, আর তার জন্যই যে পড়ে, সে তাড়াতাড়ি পড়ে এবং তাতেই মনে হয় রিয়া হচ্ছে। কিন্তু যথেষ্ট (২/৩ মিনিট) সময় নিয়ে স্বলাতটি পড়লে অন্য সুন্নতে যেমন 'খুশূ-খুযূ' হয় তাতেও হবে। তবে ফজরের সুন্নাতে মুআক্কাদার মত এ সুন্নত হাল্কা হবে; যেমন উলামাগণ বলেছেন। প্রত্যেক হাজী সাহেব

জানেন, সউদী আরবে মাগরিবের আযানের পর ৫-১০ মিনিট সময় দেওয়া হয়। অবশ্য এখানে আযান হয় পূর্ণ সময়ানুবর্তিতার সাথে।

১০। **'উক্ত দোয়াকে বিদাত বলার মতই, এই নামাযকে বিদাত বলে অভিহিত করেছেন।'** *(প্রাগুক্ত ৭পৃঃ)*

ঐ স্বলাত ও ফরয স্বলাতের পর মুনাজাত এক নয়। কারণ ঐ স্বলাতের ভিত্তি আছে; কিন্তু ঐ মুনাজাতের কোন ভিত্তি নেই। ওটার সাথে এটার কোন সাদৃশ্য নেই। আর তার মানে এই নয় যে, ওটা বিদআত হলে এটা বিদআত হবে এবং এটা বিদআত হলে ওটা বিদআত হবে।

১১। **'বর্তমানে ঐ নামাযের বয়স কম।'** *(ঐ ৭পৃঃ)*

তা ঠিকই বলেছেন। আমার সোনার বাংলার আলিমগণ তা চাপা দিয়ে রেখেছিলেন বলেই তো। কিন্তু মুসলিম বিশ্বে তার বয়স কম নয়। আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যুগ থেকেই তা চলে আসছে। সউদী আরবে এসে হাজীগণ ফিরে গিয়ে ঐ আমল আমাদের দেশে প্রচার করেন। যেমন সউদী আরবে পঞ্চ-মুনাজাত হয় না বলে হাজীগণই সেখানে প্রচার করলে উলামাগণ ধীরে ধীরে তার তাহক্বীক্ব (অনুসন্ধান) করেন। আর তারপর অভিজ্ঞ, জ্ঞানী, বিনয়ী ও উদারপন্থী উলামাগণ মেনে নেন এবং গোঁড়াপন্থীগণ তা প্রত্যাখ্যান করেন।

একদিন এক মসজিদে এক জাঁদরেল হাজী ও জাঁদরেল আলেমের মাঝে তর্ক হয়। স্বলাত শেষে মুনাজাতের পর হাজী সাহেব বলেন, সউদী আরবে দেখে এলাম, সেখানে মুনাজাত নাই। আপনারা কোথায় পেলেন? তা শুনে হযরত বললেন, সউদী আরবে কুকুর নাই, তাহলে কুকুর মেরে বেড়ান গা !!! এই তো অবস্থা।

إذا صار الرجال لا يقدرون الرجال.

১২। আব্দুল হাকিম সাহেব লিখেছেন, **'ফরয নামায যা তা পড়তেই সময় পায় না, তাতে আবার আরেকটা ভারি ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া। ঐ সময়ে ঐ নামায না পড়ে, প্রসঙ্গতঃ বলি, মাগরেবের নামায পড়ার পর সালাতুল আউওয়াবিন আছে, তা লম্বা সময় নিয়ে পড়তে পারে। তাতে অনেক নেকী। তা ৬ রাকআত থেকে ২০ রাকআত। ৬ রাকআত পড়লে জান্নাতে ঘর বানানো হয়। বারো বছরের নেকী লেখা হয়। অনেক সাহাবী অনেক তাবেয়ী ঐ নামায পড়েছেন। অমুক অমুক সহ কানপুরী সাহেবও ঐ নামায পড়তেন --- তা মামুল ছিলো ও আছে বলেই তো?'**

ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজেঊন!

আওয়াবীনের স্বলাত আসলে স্বলাতুয্ যুহার অপর নাম; যা আমাদের দেশে 'চাশ্তের

নামায' বলে খ্যাত।। মহানবী ﷺ বলেন, "যুহার স্বলাত হল আওয়াবীনের স্বলাত।" *(সহীহুল জামে' ৩৮২৭, সিলসিলাহ সহীহাহ ৭০৩, ১১৬৪, ১৯৯৪, নং)*

সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় আছে, মহানবী ﷺ বলেছেন,

(صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ)

অর্থাৎ, আওয়াবীনের (আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীদের) স্বলাত যখন উটের বাচ্চার পা বালিতে গরম অনুভব করে।" *(আহমাদ, মুসলিম, তিরমিযী, মিশকাত ১৩১২নং)*

আর এ সকল হাদীস এ কথারই দলীল যে, মাগরিবের পর উক্ত নামের স্বলাতটি ভিত্তিহীন ও বিদআত। যেমন এই স্বলাতের খেয়ালী উপকার বর্ণনায় বলা হয়ে থাকে যে, সৃষ্টিজগৎ ঐ স্বলাত আদায়কারীর অনুগত হয়ে যায় এবং ১২ বছরের কবুল হওয়া ইবাদতের সওয়াব লিখা হয়।

পক্ষান্তরে যে হাদীসে মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ের স্বলাতকে আওয়াবীনের স্বলাত বলা হয়েছে, তা সহীহ নয়; যয়ীফ। *(সিলসিলাহ যয়ীফাহ ৪৬১৭, যয়ীফুল জামে' ৫৬৭৬নং)*

তিরমিযী ও ইবনে মাজাতে যে ৬ রাকআত স্বলাত মাগরিবের পর পড়লে ১২ বছর ইবাদতের সমান হওয়ার কথা বলা হয়েছে তাও সহীহ নয়। বরং তা অতি দুর্বল হাদীস। *(যয়ীফ তিরমিযী ৬৬, সিলসিলাহ যয়ীফাহ ৪৬৯, যজাঃ ৫৬৬১নং)* যেমন ৫০ বছরের গোনাহ মাফ হওয়ার হাদীসও দুর্বল। *(সিলসিলাহ যয়ীফাহ ৪৬৮, যয়ীফুল জামে' ৫৬৬৫নং)*

তদনুরূপ এই সময়ে ২০ রাকআত স্বলাতে বেহেশ্তে একটি গৃহ লাভের হাদীসটিও জাল ও মনগড়া। *(সিলসিলাহ যয়ীফাহ ৪৬৭, যয়ীফুল জামে' ৫৬৬২নং)*

অবশ্য সাধারণভাবে নফল স্বলাত যেমন নিষিদ্ধ সময় ছাড়া যে কোন সময়ে পড়া যায়, তেমনি মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে সাধারণ নফল অনির্দিষ্টভাবে পড়া যায়। মহানবী ﷺ এই সময়ে নফল স্বলাত পড়তেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। *(সহীহুল জামে' ৪৯৬২নং)*

বুঝতেই পারছেন, জ্ঞান ও বিশুদ্ধ জ্ঞান এক জিনিস নয়। হাদীস আর সহীহ হাদীস এক জিনিস নয়। সুতরাং যদি আপনার তা তমীয করার ক্ষমতা না থাকে, তাহলে অন্ততঃপক্ষে 'তাআব্বাত্বা শার্রান'-এর মত হবেন না। নচেৎ বিপরীত বুঝলে ও বুঝালে তো বিপদ স্বাভাবিক।

শ্রদ্ধেয় জ্ঞানী পাঠক! মতভেদ স্বাভাবিক। উলামাদের মতভেদে আপনি বিচলিত হবেন না। আল্লাহ আপনাকে জ্ঞান দিয়েছেন। সেই জ্ঞানকে কাজে লাগান। এ পুস্তিকা পড়ার পর আপনি দুটি মতের মধ্যে একটি গ্রহণ করুন; যেটাকে আপনি বলিষ্ঠ মনে করেন। আপনার সময়, সুযোগ ও ইচ্ছা হলে মাগরিবের ফরয স্বলাতের আগে ঐ

স্বলাত পড়ুন; যদিও তার নির্দিষ্ট ফযীলত হাদীসে আসেনি। তবুও তা স্বলাত তো। নফল স্বলাতের ফযীলত কারো অজানা নয়।

আর হ্যাঁ, গোঁড়ামি করবেন না। কারণ গোঁড়ামি অজ্ঞতার পরিচয়।

هذا و{إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.